KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 35 B Charu Avenue, Cal-33
Collection : KLMLGK	Publisher : Swapan Majumdar Kali Kumar Chakraborty
Title : অহংকার (AHANKAR)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 3/1 8/ Winter Number 16/ Puja Number	Year of Publication : Feb- Apr 1976 Dec - Feb 1987-88 1996
	Condition : Brittle / Good
Editor : Bhaswati Roychaudhuri	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অহংকার

॥ সম্পাদনা ॥
ভাস্বতী রায়চৌধুরী

ষোড়শ বর্ষ ॥ শারদ সংখ্যা
আশ্বিন-কার্ত্তিক ॥ চৌদ্দ শ' তিন

SRIPUR AREA OFFICE EMPLOYEES'
COOP CREDIT SOCIETY LTD.
SRIPUR BURDWAN

অহংকার
যোড়শ বর্ষ।। শারদ সংখ্যা
আশ্বিন-কার্ত্তিক।। চৌদ্দ শ' তিন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

।। সম্পাদনা।।
ভাস্বতী রায়চৌধুরী

।। দপ্তর।।
৩৫বি চারু এভেনিউ
কোলকাতা-তেত্রিশ

অহংকার-এ গল্প প্রবন্ধ কবিতা অনুবাদ
অন্য রচনা আলোচনার জন্য বই পাঠান ঃ
কোলকাতায় দপ্তরে অথবা
অধ্যাপিকা ভাস্বতী রায়চৌধুরী ইংরাজী বিভাগ
পি, ডি, উইমেন্‌স কলেজ
ডাক ও জেলা ঃ জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

পঃ — পশ্চিম

বঃ — বঙ্গের

বিঃ — বিদ্যুতের

উঃ — উন্নতিকল্পে

নিঃ — নিরলস প্রচেষ্টায়

লিঃ — লিপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

নবমহাকরণ, ৭ম তল, ১নং কিরণশংকর রায় রোড

কলিকাতা ৭০০ ০০১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

।। প্রবন্ধ ।।

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ—সম্পাদকীয়
কবিতার আলো অন্ধকারে—অশোক দাশগুপ্ত
আমার কথা—ব্রত চক্রবর্তী
আমার কবিতার কথা—নীরদ রায়

।। গল্প ।।

অবুঝ বৃষ্টিপাত—নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
আগামীদিনের একটি যুদ্ধ ও প্রস্তুতিপর্ব—সমরেশ দাশগুপ্ত

।। গুচ্ছ কবিতা ।।

রাজলক্ষ্মীদেবী আনন্দ ঘোষ হাজরা সমরেশ মুখোপাধ্যায়
নীরদ রায় ব্রত চক্রবর্তী অজিত বাইরী

।। কবিতা ।।

কবিতা সিংহ দেবারতি মিত্র ইনাসউদ্দীন নির্মল বসাক
পবিত্র মুখোপাধ্যায় এনাক্ষী আচার্য প্রশান্ত দেবনাথ
মতি মুখোপাধ্যায় কালীপদ কোঙার আশুতোষ গোস্বামী
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত বাসুদেব দেব বিকাশ গায়েন প্রত্যয় প্রসূন ঘোষ
রবীন্দ্র সরকার ইন্দ্রানী বন্দ্যোপাধ্যায় সজল বন্দ্যোপাধ্যায়
সুশান্ত ভট্টাচার্য প্রতীক বন্দ্যোপাধ্যায় সুব্রত সরকার
অমিতাভ কাঞ্জিলাল বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় মানসকুমার চিনি
গৌতম চট্টোপাধ্যায় অর্ঘ্য মন্ডল আশিস মন্ডল
বিশ্বনাথ গরাই শৌভিক দে সরকার ভাস্বতী রায়চৌধুরী

।। কিছু কবিতা ।।

কবিরুল ইসলাম মঞ্জুভাষ মিত্র দেবী রায়
পার্থপ্রিয় বসু মনোজকুমার বাইন জগন্ময় মজুমদার
শুভ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র গুহ তাপস রায় শুভশ্রী রায়
অমরেন্দ্র গণাই আবদুস শুকুর খান ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত (মুখোপাধ্যায়)

।। অনুদিত কবিতা ।।

গগণ গিল ঃ কালীপদ কোঙার
মনোরমা বিশ্বাল মহাপাত্রঃ ভাস্বতী রায়চৌধুরী

।। গ্রন্থ সমালোচনা ।।

পাতার মানবী ঃ দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়—ভাস্বতী রায়চৌধুরী

বীরভূম জেলার জনগণের সেবায় নিয়োজিত

।। বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ।।

প্রধান কার্যালয় ঃ সিউড়ী, বীরভূম।
ফোন নং—৫৫৩০৪, ৫৫৩২৮

শাখাসমূহ ঃ
সিউড়ী—৫৫৩০৪, দুবরাজপুর—৯৬, নলহাটী—৩৭, মল্লারপুর—৬৬২৪১, রামপুরহাট—৪২, মুরারই—২৩, আমেদপুর—৭৫, কীর্ণাহার—৫৬, কোটাসুর—২৩৩৯, লাভপুর—২৬, বোলপুর—৫১০, বিশ্বভারতী—৩৫০, লোহাপুর—৩৭, অবিনাশপুর

জেলার দুঃস্থ ও অবহেলিত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে কৃষি কার্যে, তাঁত শিল্পে নিয়োজিত দুঃস্থ শিল্পীদের স্বার্থে ও চাকুরীজীবিদের সুবিধার্থে এই ব্যাংকের অর্থলগ্নী উল্লেখযোগ্য।

সকল প্রকার ব্যাংকিং লেনদেন করা হয় ও সকল প্রকার আমানতের উপর অন্যান্য ব্যাংক অপেক্ষা ১/২% সুদ বেশী দেওয়া হয়। সেফ-ডিপোজিট লকার ও স্বর্ণালংকার বন্ধকী ঋণের সুবিধাসহ দৈনিক আমানত জমা প্রকল্প চালু আছে।

বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের যে কোন শাখা অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানাই। জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা আমাদের পাথেয়।

বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ

মাত্র পঁচিশ বছর আগে বাংলাভাষা ভারতবর্ষ থেকে অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে এমন চিন্তা ছিল বাতুলতার নামান্তর। কিন্তু গত পঁচিশ বছরে ধীরে ধীরে এমনভাবে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে যে এখন এটি প্রাসঙ্গিক চিন্তা এবং কেউ কেউ সেরকম চিন্তা প্রকাশও করছেন। বাংলাদেশের মানুষেরও মুখের ভাষা, লেখার ভাষা বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হওয়ার মতো কোনো কারণ আপাতত নেই। সেই ফাঁড়া তাঁরা কাটিয়ে উঠেছেন ; এবং যেহেতু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভাষা বাংলা তাই সেখানে বাংলার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত।

কিন্তু ভারতীয় বাঙালী হিসেবে শঙ্কিত বোধ করি যখন দেখি এই পশ্চিমবঙ্গে বাঙলাভাষার স্রোত দিন দিন রুদ্ধ হয়ে আসছে। যখন দেখি এই বাঙলার শিক্ষিত সমাজের নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা প্রাণের ভাষা তো নয়ই, এমন কি মুখের ভাষাও পুরোপুরি থাকছে না। এমন একটা প্রজন্ম তৈরী হয়ে গেছে এবং নিয়তই তৈরী হচ্ছে যাদের বাংলাভাষার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই, ভাষায় কিছু ক্রিয়াপদের ব্যবহার ছাড়া। কলকাতার সচ্ছল শিক্ষিত সমাজে এই ব্যাপারটা খুব বেশীই দেখা যাচ্ছে। শুধু কলকাতাই নয়, এই ব্যাপারটাই ঘটে চলেছে আসানসোল, দুর্গাপুরে, মালদায়, শিলিগুড়িতে, পুরুলিয়ায় অর্থাৎ প্রায় সমস্ত শহরেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র সচ্ছল উচ্চবিত্ত সমাজে শিশু কিশোর তরুণের শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠছে ইংরেজী। এরা বাংলা বই পড়ে না। বাংলা পত্রপত্রিকা সম্বন্ধে আগ্রহহীন। সবচাইতে বড় কথা, বাংলা না জানাটা এদের কাছে অগৌরবের নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষালাভের প্রথম দিকটিতে যা ঘটেছিল আবার যেন তারই পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে। সেদিন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সদ্যশিক্ষিত নবযুবকেরা বাংলাভাষাকে হীন ও গ্রাম্য বলে মনে করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা পৃথিবীর দরজা খুলে দেওয়ায় বাংলাকে নিতান্তই সীমিত গৃহস্থালীর ভাষা বলে মনে হয়েছিল সেদিন তাঁদের। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দেশ ভাগের আগে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা ভারতবর্ষে যে কোনো ভাষাভাষীর চাইতে বেশী ছিল। দেশভাগের পরে বৃহত্তর সংখ্যক বাঙালী তৎকালীন পূর্বপাকিস্থানবাসী হওয়ায় স্বভাবতই বাংলা ভারতবর্ষে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা রইল না। দেশ ভাগ না হলে বাংলাভাষার ভারতবর্ষে প্রধান ভাষা হিসাবে পরিগণিত হওয়ার অধিকার অবশ্যই থাকত। যদিও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা স্বীকৃতি পেত এমন বলা যায় না। কেননা স্বাধীনতার আগেও হিন্দীর প্রায় সর্বজনবোধ্যতা, স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু বিশাল সংখ্যক মানুষের ভাষা হিসাবে বাংলার যে মর্যাদা পাওয়ার কথা ছিল তা ঘটল না। দেশভাগের জন্য এই মর্যাদা কমলেও দেশভাগের পরও প্রায় বিশ পঁচিশ বছর বাঙালী বাংলাকেই প্রধান ভাষা হিসাবে শিখেছে। ইংরেজীও শিখেছে কাজের ভাষা বা জীবিকার ভাষা হিসাবে। এবং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া হিন্দী প্রায় শেখেইনি। কিন্তু চিত্রটা পাল্টাতে শুরু করেছে গত বিশ বছর ধরে, সাতের দশকের মাঝামাঝি থেকে। ওই সময় নাগাদই বাংলার শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক ব্যবস্থায় একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন হতে থাকে। এই সমস্ত পরিবারে সন্তান সংখ্যায় কম থাকায় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অন্য কোন দায় না থাকায় বা না নেওয়ায় সন্তানকে ভালভাবে মানুষ করার একটা ইচ্ছে দেখা দেয়। এবং এই ভালোভাবে মানুষ করার সংজ্ঞা দাঁড়ায় উচ্চবিত্ত সমাজের অনুকরণে ইংরাজী স্কুলে ইংরাজী আদবকায়দায় পড়াশুনো করানো। ইংরাজী মাধ্যমে ইংরাজী স্কুলে পড়াশুনো করাটা প্রাকস্বাধীন যুগে ইংরেজ আমলেও ছিল। উচ্চবিত্ত

সমাজের উচ্চপদে নিযুক্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজীয়ানাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। স্বাধীনতার পর আমাদের শাসন ব্যবস্থার বা প্রশাসকদের জীবন যাপনে সে রকম কোনো আমূল পরিবর্তন তো হলই না, বরং এক সময়ে ইংরেজরা উচ্চবেতনের যে পদগুলি কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন, ভারতীয়রা সেই পদগুলি পেয়ে ইংরেজদের মতই চাল চলন করা প্রয়োজন মনে করতে লাগলেন। এর ফলে শহরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের একটি কি দুটি সন্তানকে ওই পদগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলার চিন্তার দ্বারা তাড়িত হয়ে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়লেন। ছয়ের দশকে লেখা একটি রচনায় সৈয়দ মুজতবা আলি আই. এ. এস্ পরীক্ষার ইন্টারভিউয়ে বাঙালীর ছেলের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বাঙালীর মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও কথ্য ইংরেজী এবং ইংরেজী আদবকায়দার প্রতি বিরাগের কথা জানিয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে যখন মাতৃভাষাই সমস্ত কাজকর্মের মাধ্যম হয়ে উঠবে তখন যে আবার বাঙালীর মাতৃভাষাচর্চা বাঙালীকে এগিয়ে দেবে, ঠিক যেমন একদিন ইংরেজী শিক্ষা বাঙালীকে সারাভারতে এগিয়ে দিয়েছিল,—সেই আশাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তারপরেই পরিস্থিতি পাল্টে যেতে লাগল। সন্দেহ নেই এর কারণ অর্থনীতিক। ভালো চাকরি পাওয়া, সারাভারতের প্রতিযোগিতার বাজারের জন্য উপযুক্ত হওয়া, এইটিই ছিল প্রথম কারণ। কেননা, এইসব ছেলেমেয়েদের বাবামায়েরা এক সময় ভালো ইংরেজী বলতে না পারা বা আদবকায়দায় অনভিজ্ঞতার জন্য অসুবিধাবোধ করেছেন। ভালো চাকুরি, উচ্চবেতন, উচ্চপদ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভেরও কারণ হয়ে ওঠে, এই অভিজ্ঞতাও তাঁদের হয়েছিল। ইংরেজীয়ানা আগেও উচ্চবিত্ত সমাজে ছিল। প্রথমে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, তার পরে স্বাধীনতা আন্দোলন মাতৃভাষার চর্চা ও সমৃদ্ধির দিকে বাঙালীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

দেশভাগের পর বাঙালীর জাতীয়তাবাদে একটা বিরাট ধাক্কা লেগেছিল। এক বিশাল সংখ্যক বাঙালীর মধ্যে গৃহহীনতার স্বদেশহীনতার বোধ তৈরী হল। বহু কষ্টে ও চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া এই সব বাঙালীর কাছে নিজের ভাষা বা দেশের প্রতি মমত্ববোধের চাইতে অনেকবেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও স্বস্তি, সামাজিক সম্মান। আর এর জন্য প্রয়োজন ছিল ইংরেজীয়ানার। কারণ স্বাধীনতার পরও দেশে ইংরেজীয়ানার মর্যাদা কমেনি, বরং স্বাধীনতা আন্দোলনজাত দেশাত্মবোধের আবহাওয়া না থাকায় আরো, বেড়েছে। মধ্যবিত্ত বাবা মা তাঁদের সন্তানকে উচ্চবিত্ত সমাজের মর্যাদাভুক্ত দেখতে চেয়ে ইংরেজীনবিশ করে তুলতে চাইলেন, এবং সেখানে ইংরেজী ভাষা জানাটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, যত গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজী বলতে পারা এবং ইংরেজী আদবকায়দায় অভ্যস্ত হওয়া। সত্যি বলতে কি বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলিতে একজন অত্যন্ত ভালোভাবে লিখিত ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করলেও ইংরেজী বলার ক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত থেকেই যেত। এবং সম্ভবত ইংরেজরা একজন ভারতীয়ের কাছ থেকে যতটা ইংরেজী এবং ইংরেজীয়ানা প্রত্যাশা করত আধুনিক যুগের ইংরেজদের পদগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভারতীয়রা তার চাইতে বেশী নিখুঁত ইংরেজী ও ইংরেজীয়ানা প্রত্যাশা করতে লাগল।

গৃহচ্যুত বাঙালীর এখন মর্যাদার স্থল হয়ে দাঁড়াল তার চাকরি। এবং এই চাকরির জন্য বাঙালী ইংরেজী ভাষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। এবং যেহেতু পুরনো ইংরেজী স্কুলগুলিতে আসন সংখ্যা সীমিত তাই সাতের দশক থেকেই ব্যাঙের ছাতার মত ইংরেজী স্কুল গজিয়ে উঠতে লাগল। এবং এই সব স্কুলে যতটা না ইংরেজী শেখা হল তার চাইতে বেশী শেখা হল মাতৃভাষার সম্বন্ধে উপেক্ষার মনোভাব। মা বাবা যত খুশী হয়ে উঠতে লাগলেন সন্তানের ইংরেজী শিক্ষায়, শিশু সন্তানটি ততই বুঝতে লাগল মা বাবা যে ভাষায় কথা বলে তার কোনো

মর্যাদা নেই। এমনি করে মাতৃভাষা বাঙলা সম্বন্ধে এক অসম্মানের বোধ নিয়ে একটি প্রজন্ম বড় হয়ে উঠল। স্কুলে বাড়িতে সে বাঙলা বললে তাকে অপমানিত হতে হত, বকুনি খেতে হত, এখনো হয় এই সব স্কুলের শিশুদের। এই ব্যাপারটির একটি আশ্চর্য হৃদয়গ্রাহী চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'দুইভাষা' গল্পে। পৃথিবীতে আর কোথাও এরকম ঘটনা ঘটে কিনা জানা নেই।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মোহের প্রধান কারণটি অবশ্যই আর্থ-সামাজিক, দ্বিতীয় কারণ অবশ্যই বাঙালীর আত্মমর্যাদাবোধের স্খলন। বাংলাভাষার মতো একটি সমৃদ্ধ গৌরবময় ভাষা সম্বন্ধে অবজ্ঞার মনোভাব নিয়ে যারা বড় হয়ে উঠল আটের দশকে ও নয়ের দশকে, আজ আমরা তাদের বাংরেজী শুনে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে উঠছি। কিন্তু তার দায় তাদের নয়। বস্তুতঃ শিক্ষিত বাঙালীর এই মাতৃভাষা ভুলে যাওয়ার জন্য দায়ী পূর্বতন প্রজন্ম, এই সব ছেলেমেয়েদের বাবা মায়েরা যাঁরা নিখুঁত ইংরেজী না জানার হীনমন্যতায় ভুগতেন। ইংরেজী শিক্ষার গৌরব সম্বন্ধে যাঁদের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ যারা একদিন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্তম্ভস্বরূপ ছিল আজ তাদের মধ্যেই বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সর্বাধিক অজ্ঞতা।

বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবশ্য আর একটি জিনিষও থাবা বসিয়েছে। তা হল দূরদর্শন। সংস্কৃতি জগতে এই শেষ অথচ অসীম শক্তিধর আগন্তুকটি অল্পকালের মধ্যেই বাঙালীর সংস্কৃতি জগতের সর্বাগ্রগণ্য নায়ক হয়ে উঠেছে। দূরদর্শনে বাংলাভাষার অস্তিত্ব ছিটেফোঁটা। হিন্দী অনুষ্ঠানের দাপট ও আড়ম্বর উঠতি প্রজন্মের মনোজগৎকে প্রবল বিক্রমে কব্জা করে ফেলেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে রুচির একটা নিম্নমুখী প্রবণতা সর্বদাই থাকে। নিম্নরুচির উপকরণ পেলে তাই দিয়েই চাহিদা পূরণ করার সুযোগ তারা ছাড়ে না। মানুষের রুচিকে উন্নত করার শিক্ষিত করার প্রয়াস যে কোনো দেশের বুদ্ধিজীবিরাই করবেন এটাই প্রত্যাশিত। মানুষের রুচি নিম্নাভিমুখী হলে তাদের সেই রুচিকেই যদি সাহিত্য সংস্কৃতি প্রশ্রয় দেয়, তাহলে দিন দিন একটা দেশের সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে সার্বিক অবনতি ঘটতে থাকে, যা আজ এই দেশে ঘটছে। হয়তো বা সারা পৃথিবীতেই সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা কাজ করেন যাঁরা মানুষের চিত্তকে সমৃদ্ধ, রুচিকে নিয়ন্ত্রিত করবেন তাঁদের যদি নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা না থাকে, তাঁরা যদি যা বেশী বিক্রি হবে তাই উৎপাদন করেন তাহলে রুচি অবধারিতভাবে আরো বেশী নীচে নেমে যাবে। এবং সেই তারল্য মানুষকে গভীর উপলব্ধির জগৎ থেকে কেবলই সরিয়ে নেয়। এইভাবে ক্রমান্বয়ে এক অগভীর বিনোদনমূলক তরল সংস্কৃতির স্রোতে সাধারণ মানুষ তলিয়ে যায়। অবস্থা এমন হয়েছে যে বহু বাঙালী আজ টিভিতে হিন্দী সিরিয়ালের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে এই পশ্চিমবাংলায়।

শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যপাঠে আগ্রহী হচ্ছে না। এর ফলে বাংলা সাহিত্য সমজদার পাঠক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যে তরুণশ্রেণী সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখে তারাই যদি মাতৃভাষাচর্চার অভাবে এবং মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার বোধের মধ্যে বড় হওয়ায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে দূরে চলে যায়, তবে সেটি চিন্তার কারণ সন্দেহ নেই।

বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শংকিত হওয়ার কারণ থাকলেও একেবারে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। কেননা একটি আশার স্বর্ণরেখাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এই শতাব্দীর শেষে যদি শিক্ষাকে আরো অনেক বেশী ছড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি শিক্ষা শুধু উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত সমাজে গন্ডীবদ্ধ না থাকে, যদি শিক্ষা আরো অনেক বেশী করে আমাদের গ্রামজীবনে প্রসারিত হয়, তাহলে এই

গ্রামবাসী বিশাল জনগোষ্ঠীর ভেতরে বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতি আবার সহৃদয় পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক খুঁজে পাবে। বাংলার সাহিত্য আর শুধুই নাগরিক থাকবে না। লোকসংস্কৃতির ফল্গুধারার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে হয়ত অন্য একটি শক্তিশালী ধারার সৃষ্টি হবে। হয়ত অন্য এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর নির্যাস লেগে যাবে বাংলাভাষার গায়ে, বাংলা সংস্কৃতির গায়ে।

হয়তো আগামী শতাব্দীর শুরুতে শিক্ষা অনেক বেশী করে গ্রামীন মানুষের জীবনে প্রবেশ করবে। যদি তাই হয়, তাহলে হয়তো আগামী শতাব্দীর প্রথম দশকে কোনো কৃষকবধূ দিনের শেষে সূর্যাস্তের আভায় গ্রামের গ্রন্থাগার থেকে নিয়ে আসা কোনো নবীন লেখকের উজ্জ্বল গ্রন্থপাঠে নিমগ্ন হয়ে থাকবে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেই সুদিনটির জন্য অপেক্ষা করাও কম আনন্দের নয়।

[স. অহংকার]

সাজো সাজো রব পড়েছে
ঢাকে পড়লো কাঠি
দুর্গা ঠাকুর এলেন বলে
হচ্ছে পরিপাটি
পাড়ায় পাড়ায় মন্ডপে সব
আলোর রোশনাই
নিয়ম মাফিক নিলে পরে
কারোর দোষ নাই
কিন্তু যদি মন্ডপে
চলে চোরাই আলোর খেলা
মুখ ফিরিয়ে থাকবেন মা
ঠিক সন্ধ্যাবেলা

পূজা মন্ডপে বিধিসম্মত উপায়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

ভীষণ সাহসী

ভীষণ সাহসে মেয়ে ধেয়ে যায় — দৃক্‌পাত করে না।
হৃদয়ের ধনখানি ছোঁ মেরে তুল্‌বে ব'লে একাগ্র অটল।
দিনেরাতে অমাবস্যা—পূর্ণিমায় লক্ষ কোটি ছল
একই লক্ষ্যে স্থির, যাতে সমগ্র হৃদয়ভূমি হ'য়ে যায় কেনা।

তুমি সোমবারে সত্য, অসম্বৃত, উথাল পাথাল—
মঙ্গলবুধ নাগাদ ফিরবে ধনুকে গুণ বেঁধে।
পূর্ণিমা-প্রলাপগুলি মুছে যাবে অমানিশা-খেদে।
আহা, পুরুষ, পুরুষ! এই অসম সংগ্রামে কাটে কাল।

প্রাণের অধিক সে যে

প্রাণের অধিক জনে কেন গোটা প্রাণটি দিলে না!
কবিতার জন্যে কেন রেখে দিলে একান্ত আরতি?
এ তোমার জন্মশাপ—বহন করছো দিনে-রাতে,
তবু জলে তুমুল তরঙ্গ ; চির চাঁদ মুখচেনা।

পুষ্পগুচ্ছ ছিল তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে। মালা গাঁথা
তোমার অভীষ্ট ছিল—তবু ঠিক হ'য়ে উঠ্‌ল না।
কবিতার কুকুরকুন্ডলী ঘুম প্রাণের কোণায়—
দরজা খুল্‌তে গিয়ে মাঝখানে প'ড়ে গেল বাধা!

কে কেমন কবিতা

কে কেমন কবিতা লিখেছি ছাই নিজেরা কি জানি?
কেউ কিন্তু কারুর মতন ঠিক লিখ্‌তে চাইনি।
যে যার প্রাণের ভাষা উচ্চারণ করি। তবু কাহাদের হাত
মেপে নেয় কতোটা শব্দের নুড়ি, কতোটা প্রপাত?
মই লাগিয়ে এ কাহারা মাপছে উচ্চতা? পিরামিড
বসে আছে, অস্তিত্বে ও আকারে সে বিশিষ্ট, নিভৃত!
তোমরা গভীরে রশি নামিয়েছ ঘাটলায় ব'সে
সাঁতারের জন্যে আমরা সবাই তো আছি রসে বশে।
ডুব দিয়ে কোনো কবিকেই কিন্তু পারবে না ছুঁতে,
তবে কেন মাপামাপি? স্নান ক'রে নাও প্রাণাম্বু-তে।

একান্ত সমীপে থেকো

একান্ত সমীপে তুমি থেকো—কিন্তু পায়ে পায়ে নয়।
নিরন্তর রক্ষা কোরো লালসার অগ্নিকুন্ড হ'তে,
হাত ধ'রে পার কোরো বাসনার দুর্নিবার স্রোতে,
সংকট সাধ্‌তে দিয়ো—হাতে রেখো নিত্য বরাভয়।

পতংগের মতো আমি গজাবো পাখ্‌না। ছট্‌ফটে
মন দোলা খাবে ঢের চাওয়া - না - চাওয়ার ঘুরপাকে।
স্বয়ম্বরে যেন বহু বিচিত্র ছায়াশরীরী থাকে,
শেষ পর্বে জান্‌তে দিয়ো—তুমি একা বাস্তবিক বটে।

এই হৃদয়ের আশা

এই হৃদয়ের আশা অন্য ছিল। যে পথিক পথ
হারিয়েছে, তার কাছে। ফুল দেব, নেব না শপথ।
বিচিত্র এ সাধ ছিল—সাকী নয়, সখী হব আমি,
নিঃসংগ দিনের সাথী। বিনোদন বিকাব বেনামী।

ভালোবাসা যেন সুখ-নিদ্রায় ভ'রে দেয় সারারাত,
এইটুকু চেয়ে, এ-ই শুধু চেয়ে, ছুঁয়েছি তোমার হাত।
মুঠোয় পুরেছি হাতের জোনাকি, লাজুক রাতের আলো।
অরণ্য তার চাঁদের আগুন নিবিয়ে দিয়ে, ঘুমালো।

যায় রাত্রি স্বপ্নভঞ্জনের পথে

যায় রাত্রি স্বপ্নভঞ্জনের পথে। কে কবে স্বপ্নের
শেষভাগ দেখেছিল? নাটক যখন জমজমাট,
শোরগোল ওঠে প্রেক্ষাগৃহে ; কে বা কারা ইতস্তত
রঙ্গমঞ্চে উঠে আসে ; মিশ খায় আলো-অন্ধকারে।

সম্রাজ্ঞী ময়ূর-সিংহাসনে বসবার ঠিক আগে,
প্রেমিক প্রিয়াকে দীর্ঘ চুম্বনের ঠিক মধ্যভাগে,
নষ্ট মৃত শিশু তার মাতৃক্রোড়ে যেই দেবে ঝাঁপ,
কিলিবিলি খুলে যায় স্বপ্নের বুনোট। সুতাগুলি
শিথিল ইচ্ছার মতো রিক্ত, অবসিত, ঢুকে যায়
জীবনের তাঁতঘরে। বোনা হয় চৌখুপী নিরেট
গামছা, যা' ব্যবহার্য, বাজারে যা' পাবে বাঁধা রেট।

সন্ধ্যার প্রতীক্ষা

ঘরে যদি যাবে তবে সন্ধ্যা হলো ঘরে ফিরে যাও
ঘর যদি থাকে তবে ঘরে ফিরে অবশ্যই যাবে
পাখিরাও ওড়ে নাকো রাত্রি হলে শান্ত স্থির গাছের শাখায়
স্তব্ধতা আকাঙ্খা করে ; তেমনি সবাই
সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করে ঘরে যাবে ব'লে।
তা নাহলে মুগ্ধ অপেক্ষায় থাকা নজরুল মঞ্চের সারিতে
ভীমসেন যোশী এসে গান গাইবেন ;
হয়তো তিনি কখনোই পৌঁছবেন না মঞ্চের আলোতে
তবু তো আশায় থাকবো আমরা সকলে
যদি বা আসেন তিনি, গান গান, যদি বা আসেন।

আলো ধীরে ক'মে আসছে বন্ধ করো দর্পণের মুখ
নারী তুমি তাকিয়ে থেকো না আর দর্পণের দিকে
আলো ক্রমে কমে আসবে নিজের ছবির কথা
ভুলে যেতে হবে
দেশকাল বুনোনের জটিলতা অকস্মাৎ মুছে যাবে, নারী—
এখন বৃক্ষেরা মুছে যাবে শাখা মুছে যাবে তাহাদের
আন্দোলনও যাবে
পরম আশ্রয় যেন নত হয়ে শাখারাই তুলে নেবে
পাখিদের দল
আমাদের অনিশ্চিত পদক্ষেপ জড়িয়ে জড়িয়ে যাবে
অন্য পদক্ষেপে
সেও এক চমৎকার স্পর্শসন্ধ্যা সেও এক অনবদ্য সুখ.....
ঘর যদি থাকে তবে ঘরে ফিরে অবশ্যই যাবে
পাখিরাও ওড়ে নাকো সন্ধ্যা হ'লে শান্ত স্থির
গাছের শাখায়।

সময়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কয়েকটি লাইন অথবা শঙ্খমালাকে

তোমার গতি কি শুধু উজ্জীন আলোক গায়ে মেখে?
কেবল সম্মুখে ছুটে চলা?
তাহলে আমিই শুধু লক্ষ বছরের পরে ক্লান্ত হয়ে যাবো?
ক্লান্ত হবে বাহুমূল, জঙ্ঘা, উরু, সমগ্র শরীর?
সীমাস্পর্শ করা গেল ব'লে মনে হ'লে
কল্যাণ রেখার কাছে নতজানু হতে চাই যদি
ভূমি খুঁজে পেতে চাই যদি
আবার অশান্ত ক্রোধ আবর্তে আবর্তে জেগে ওঠে
আবার সংগ্রামধ্বনি শোনা যায় তুমুল গভীর শঙ্খনাদ।
এরকম অনন্ত সংগ্রামে লিপ্ত হ'লে
কোথা সফলতা ক্ষেম অবসর শান্তি সমবায়?

নিয়ন্ত্রণ-উৎস তবু পেতে হলে কোনো এক সন্ধির সময়
থেমে গিয়ে পিছনের দিকে চেয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধ'রে
তোমার শঙ্খের রূপ অনাবিল বিশুদ্ধ ধবল
দেখে নিতে হয় ব'লে শঙ্খমালা—
এ রকম ক্লান্তি ভালো, ঘুম ভালো, মাঝে মাঝে
সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আর কল্পনার সীমার বিভ্রমে।

তা না হলে মোহনার দিকে কেউ যেতে পারে নাকি
ক্লান্তিহীন সময়ের ক্ষোভে?

চলতে চলতে

চলতে চলতে যখন তুমি
বৃক্ষ কিংবা শূন্য কিংবা
পাথর ;
তখনই এক দমকা হাওয়া
মাতাল হাওয়া উথাল পাথাল
শূন্য ভরায় শাখা দোলায়
তড়িৎ বেগে
নদী
আছড়ে পড়ে বুকের ওপর
জলধ্বনি
এবং শীকরকণা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখছি

যারা অহংকার করেছিল,
তারা পলাতক।

তারা রয়ে গেছে, যারা
শরতে শ্রাবণে
দুর্দিনে সুদিনে
মাথা উঁচু করে গাইতে পেরেছিল ঃ
'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার পরে.....'

আর আমি? আমি নিজেকেই বলি ঃ
ঢাল নেই তলোয়ার নেই,
ও নিধি সর্দার তুমি
কী করে যে এত রাস্তা এলি!

নৌকো

হাজার বাধার ভেতর
যে যার নৌকো গড়ে।

যে যার নৌকো ভাসায়
অজয় এবং কাঁসায়।

কারও নৌকো ফেরে
কারও নৌকো ফেরার।

অজয় এবং কাঁসায়
কাঁদায় এবং হাসায়
এবং ভালবাসায়
নৌকো ভাসাই রোজ।

নৌকো হারাই রোজ।

বসন্ত ১৯৯৬

জেগে দেখি বসন্ত দ্বারে।

টাকায় পুড়িয়ে রাস্তায় কারা
ধোঁয়া উৎসব করে।

সিটি দিতে দিতে পাড়ার ছেলেরা
পিকনিক সেরে ফেরে।

বচসার পরে পাশের গলিতে
দু'একটি বোমা পড়ে।

চটি ফটফট পাড়ার মেয়েটি
টিউশন সেরে ফেরে।

আমার কথা ❐ ব্রত চক্রবর্তী

কবিতার সঙ্গে? তা অনেকদিন। আগে রোজ লিখতুম। কবুল করা ভাল, এখন রোজ লেখা হয় না। বসা হয় না। আগের মতই অভ্যেস। লেখাটা আগে মনে মনে তৈরি হয়। কিছুটা তৈরি হলে সে-ই লেখার টেবিলে টেনে এনে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বসিয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ, 'লেখা কম দেখছি কেন' লোকে যখন জিজ্ঞেস করেন, প্রশ্নটা খুব একটা ভাল লাগে না আমার। আমি কি চুক্তি করে বসে আছি নাকি, যে দিস্তে দিস্তে লেখা যোগান দিয়ে যাব? তা তো নয়। তবে? আসলে, কবিতা লেখার সঙ্গে নিজের যে ভালবাসা বা তৃপ্তি জড়িয়ে থাকে, গাদা গাদা লিখে আমি সেই তৃপ্তি হারাতে রাজী নই। একটা কবিতা শেষ করার যে তৃপ্তি আর ভাললাগা, তা কবি আর ঈশ্বর জানেন। কবি কি ঈশ্বর? প্রশ্ন উঠতে পারে। আমার জবাব, হ্যাঁ কবিও ঈশ্বর, তিনি যতক্ষণ কবি। আমি যখন কবিতার পাঠক তখন একটা কোনও ইশারা বা সংকেত খুঁজি এই জীবনের, না পেলে সেই কবিতা আমায় তত স্পর্শ করে না। কবিতার হাত ধরেই আমি একদা নিজের ব্যক্তি জীবনের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' পেরিয়েছি। তার কাছে আমার অনেক ঋণ, কৃতজ্ঞতা। আজও সে আমার অন্যতম প্রিয় সঙ্গী। আমি তাকে বিনীত বিনয়ে বলি, প্রিয় সখা হে, ছেড়ো না.....।

অন্য কোন নামে

নিরঞ্জন, নিরঞ্জন—হেঁকে গেলো দুপুরের মতিচ্ছন্ন হাওয়া।
কোথায় নিরঞ্জন!
শুধু গাছের ক'টি পাতা নড়লো,
শুধু শুকনো ধুলো উড়লো
নিরঞ্জনের মার কান্নার মতো।
মৃত্যুর এখন কোনো ছদ্মবেশের অভাব নেই।
দু'চারদিন চৌরাস্তার মোড়ে, বাজার-গলিতে
নানা কথার জল্পনা ; তারপর
দ্রুত নামবে বিস্মৃতি, ধুয়ে নিয়ে যাবে
শেষ শোকচিহ্ন।
অন্যকোন নামে হঠাৎ-ই আবার
কেঁপে উঠবে স্থিরতার জল।
অন্যকোন নামে হেঁকে যাবে দুপুরের মতিচ্ছন্ন হাওয়া।

অপরাহ্নের আলো

অপরাহ্নের আলোয় ভাসছে মায়াবী পৃথিবী। কুহক আলোর ভেতর থেকে সারস উড়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার আকাশে। আকাশ-দর্পণে ফুটে উঠছে একটি দুটি নক্ষত্র। চরাচর ঘিরে এমন নৈঃশব্দ্য যেন একা একা কথা বলা যায় আলোকবর্ষের ওপারের নক্ষত্রদের সঙ্গে। দিগন্তরেখায় প্রহরীর মতো নিবিষ্ট গাছগাছালি ; তারাও কান পেতে আছে তোমার নিভৃত উচ্চারণ শুনবে ব'লে। তুমি উচ্চারিত হও। উচ্চারিত হও বুকের গভীরতম প্রদেশ থেকে। কতো স্বপ্ন, কতো মায়া, কতো ব্যাকুলতা নিরুচ্চার স্তব হয়ে আছে। ঐ অনাদি আকাশ আর এই স্মৃতি ভারাতুর পৃথিবী উৎকর্ণ হয়ে আছে তোমারই প্রতি, তুমি দূরতম অরণ্যের মতো মর্মরিত হও।

অনির্বচনীয়

প্রতিবেশীর ছাদে দেখলুম, একটি গোলাপ ঝুঁকে আছে বিকেলে। পটভূমি রচনা করেছে বিশাল আকাশ। বৃহতের মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি ফুল অনির্বচনীয় ঐশ্বর্যে বিকশিত হয়ে আছে। মনে হলো, ঐ সীমাহীন আকাশ, সীমায় বন্দী ফুলের ভেতর দিয়ে কথা বলতে চাইছে আমার সঙ্গে। আর আমার হৃদয় আনন্দে, বিস্ময়ে, পুলকে পুড়ে যেতে চাইছে পৃথিবীর বুকে।

পুড়বে একাকী

বাতাসে ঝরছে ফুলের নির্যাস ;
একদিন তোমারও শরীর থেকে ঐ রকম
গন্ধ ফুটে বেরুবে,
যেদিন তোমার অন্ধকার বুকের
ভেতর থেকে জেগে উঠবে সূর্য।

একদিন তোমারও ত্বক থেকে
ফুটে উঠবে রোদ্দুর,
যেদিন মেঘের মতো বৃষ্টি হয়ে
ধুয়ে যাবে মনের ছায়া-উপছায়া।

একদিন তোমারও দেহ-দেউল
থেকে পাকিয়ে উঠবে সুগন্ধ,
বাতাসের ডানায় ভর ক'রে
ভেসে যাবে দূরান্তে—
যেদিন পুড়বে তোমার হৃদয়,
পুড়বে একাকী ধূপের মতো।

নগণ্য বেঁচে থাকা

পাখির মতো উড়ে যেতে পারি না কোথাও
নদীর মতো ছুটে যেতে পারি না সমুদ্রে
অরণ্যের মতো ছুঁতে পারি না আকাশের সীমা
খুব ছোট জীবন আমাদের, দৈনন্দিন তুচ্ছতার
মধ্যে, সামাজিকতার ধুলো বালির মধ্যে খুব
নগণ্য বেঁচে থাকা ; পোড়ো-ঝুপড়ির মতো
মুখ থুবড়ে থাকা উদয়াস্ত। সংকুচিত
জীবন-যাপনের মধ্যে না আছে হৃদয়ের প্রসারতা
না মনের সামুদ্রিক গভীরতা।
দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, অপমানের পাঁকে
জিয়ল মাছের মতো ডুবে আছি। সর্বাঙ্গে
থিকথিক করছে কাদা ; ঈর্ষা, লোভ, হিংসা
ভেতর থেকে কুরে-কুরে খাচ্ছে মসৃণত্বক
ফলের ভেতর আত্মগোপনকারী কীটের মতো।
পাখির মতো উড়ে যেতে পারি না কোথাও
নদীর মতো ছুটে যেতে পারি না সমুদ্রে
অরণ্যের মতো ছুঁতে পারি না আকাশের সীমা

ঘেরাটোপ

সন্ধ্যেবেলা একটা চামচিকে ঘরে ঢুকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। দরজা জানলা খোলাই ছিলো। তবু বেরুবার পথ পাচ্ছিল না। ক্রমান্বয় ঠোক্কর খাচ্ছিল এ-দেয়ালে, ও-দেয়ালে। প্রায়ান্ধকার ঘরে বন্দী চামচিকের অসহায়তা আমাকে মুখোমুখি করিয়ে দিলো অমোঘ সত্যের ঃ বাইরে মুক্তি, বাইরে অবাধ স্বাধীনতা ; তবু অস্তিত্বের ঘেরাটোপ থেকে বেরুতে পারে না মানুষ।

খ'সে পড়া

দেখি, শুধুই খ'সে পড়া—
আকাশ থেকে উল্কা
পাহাড় থেকে পাথর
গাছ থেকে পাতা
পাড় থেকে বালি
আর
সময় থেকে জীবন

মৃত্যু

মৃত্যুর কথা ভেবেছি বহুদিন
ফিরে-ফিরে মৃত্যুর কথাই ভাবি

আর হারিয়ে যায় কথা

নৈঃশব্দ্য
ডানা মেলে
আকাশ থেকে দূরতর আকাশে।

উনুনের চারপাশে

উনুনের চারপাশে খিদে নির্মাণ করে এক শিল্প,
হাত পাখার হাওয়ায় সামনের দিকটা তার যতটা জুড়োয়
পেছনের দিকটা ততটাই গুমোট, শ্রম শিবিরে লাগাতার গ্রীষ্মকাল,
রোজ চাঁদ ওঠে সেখানটায় দু'তিন ঘন্টা দেরিতে,
দলে ভারি হয় সন্দেহভাজনেরা--,
মুখের ফরসা পরিচয়ে শেষ অবধি যারা কাছে আসে
অগ্নির সম্মুখে খুলে রাখে ব্যবহার, সন্ধ্যেবেলার আলিঙ্গন,
শোয়ার ঘরের সামনে তাদেরও চেনা যায় না ঠিকঠাক,
কথা দিয়ে রাত্রি সরে না--
খিদে মেটে না স্বপ্নের লাভজনক বিনিয়োগে--
জল সেদ্ধ হয় জলে, হিংসা সেদ্ধ হয় কিসে?

হিজিবিজি রাস্তার মুখে

ঘুমিয়ে ছিলো তিস্তার চর পায়ের কাছে তার অল্প অল্প শীত,
ঘুমিয়ে ছিলো চা বাগানের সবুজ, সবুজে বিছানো মাইল মাইল কুয়াশার ওড়না
ঘুমিয়ে ছিলো কুলীকের নবীন বনাঞ্চল--
ভিনরাজ্য থেকে উড়ে আসা ঝাঁক ঝাঁক পাখিদের একটুখানি সাদা,
সাড়ে তিনহাত আনন্দ নিয়ে মানুষ আজ--
উনুনের আঁচ নিয়ে সেখানেও গিয়েছে পৌঁছে সপরিবারে,
দেওয়ালে ফাটলের দাগ, বুকে পুরনো স্মৃতির গুঞ্জন নিয়ে
হাইওয়ের পাশে একা একা ঘুমিয়ে ছিলো পান্ডুয়া
তোর্ষার একহাঁটু জল, বন্যার পর একপায়ে দাঁড়ানো বাঁশের সাঁকো,
ফুল ও পাতায় ঢেকে যাওয়া মংপুর বাংলো বাড়ি--
খেলনা-পুতুলের সমান একটুখানি আহ্লাদ নিয়ে
মানুষ আজ সেখানেও এক একটা দিনকে করেছে ভুলুণ্ঠিত,

ভালোলাগাকে তিনদিক দিয়ে সাজাবে বলে--
গাছেদের সুপ্রাচীন শরীর থেকে দশ ইঞ্চি করে সবুজ
ছেঁচে নিয়ে গেল যে যার বাড়িতে--
রাত্রির যে অংশটুকু মানুষের দুঃখকে গল্প শোনায় ভোরবেলা
আজ কেউ কেউ তাকেও করছে দেশ ছাড়া,
কুড়োল দিয়ে এক একটা নদী ও ঝর্ণাকে দখল করেছে যে যার মতো
বোমাবাজির ভয় দেখিয়ে ভালোবাসাকে শ্মশানের দিকে পাঠিয়ে
অসংখ্য হিজিবিজি রাস্তার মুখে আজ মানুষ ও তার সন্তান-সন্ততি।

চিনতে না পারা

যতই কারুকার্যময় হোক মুঠো আলগা বিষাদের এই প্রণয় কাহিনী--
চাদরে মুখ ঢেকে সরে যাক এক একটা বিকেল--
তবু এই ফিরে যাওয়া নিয়ে মন খারাপের কোনো মানে হয় না,
বড় রাস্তা থেকে ঘিঞ্জিগলির রোঁয়া ওঠা দু'একটা বাঁক
পেরোতে না পেরোতেই এক একজনের বুক অবধি কেবল কুয়াশা--
হাঁটুর সমান বয়স যে সব প্রীতি ও শুভেচ্ছার--
অবিকল জলের মতো দেখতে যে সব সম্পর্ক আর আলিঙ্গন--
তারাও আজকাল ঘন্টায় ঘন্টায় চেয়ার পাল্টায়,
তাদেরও চাই নিজস্ব একটা জেলা কিংবা পরগণা,
দেশকাল নিয়ে পাহাড় সমান মন্তব্য তাদেরও,
অথচ ঘরবারান্দা, রাস্তাঘাট, পরিচিত মুখের ভূগোলে--
আজকাল চব্বিশ ঘন্টা অল্প অল্প শীত, আর নিঃসঙ্গতা,
কত কি করার থাকে কত কি দেখার--
সেখানে এখন শুধু একটু একটু করে বেড়ে যায় দূরত্ব--
আমরা আর ক'জন তাকে ঠিকঠাক চিনে উঠতে পারি!

মিঠুদের বাড়ি অবধি

মিঠুদের বাড়ি অবধি কোনো দুঃসংবাদ নেই,
ঐ অবধি জলতেষ্টা নেই, নেই পেশী ফোলানো রাত্রি
বন্যা ও খরা নেই, নেই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণও--
রাস্তার মোড়ে মোড়ে আইসক্রিম হাতে হাসিখুশির মেয়েরা
অবিকল যেন তিরিশ বছর আগের সুচিত্রা সেন,
মিঠুদের বাড়ি অবধি সকলের বয়স আঠারো থেকে চব্বিশ,
সকলের গানের গলা যেন হেমন্ত মুখার্জী,
ডাক পিওনের ভূমিকায় নেমে এক একটা শীতের সকাল
বাড়ি বাড়ি বিলি করে চলে যত সব জরুরী চিঠি ও টেলিগ্রাম,
মিঠুদের বাড়ি অবধি কোনো ধর্মঘট নেই,
নেই অসুখ বিসুখ, বাতাসও যেন সুস্বাদু পানীয়,
ঝগড়া ঝাটি ভুলে রোগা পাতলা মন খারাপগুলি হয়ে যায়
যেন বাইশ ক্যারেটের এক একটা সুবোধ বালক,
মিঠুদের বাড়ি অবধিই কেবল জেগে থাকে শহর গ্রাম
তারপর, আর কোনো তারিখ নেই ঠিকানা নেই,
সবটাই যেন পৃষ্ঠা উলটিয়ে ঘুমিয়ে পড়া এক একটা দশক।

আমার কবিতার কথা ❐ নীরদ রায়

কবিতার শরীর ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে কবিতার গতি প্রকৃতি প্রথা ও প্রকরণ। এই নিয়মের হাত ধরে বর্তমান প্রজন্মের কবিরা নিজেকে ভাঙেন ক্রমাগত ভেঙে চলেন। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে বাঁক নেয়ার। ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে কখনো কখনো কাচের মধ্যে হীরকখন্ড ঝলসে ওঠে এবং অম্লান কোনো দ্যুতি বিকিরণে মহিমময় রূপ ধারণ করে। চিন্তায় মননে, ভাষা প্রয়োগে চিত্রকল্পে, বাক্‌প্রতিমায় যেমন সাম্প্রতিককালের দেশ সমাজ রাজনীতি মানুষের জটিল মানসিকতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে, কবিতায় তেমনি নিপুণভাবে ফুটে উঠছে প্রেমের আর্তি না পাওয়ার যন্ত্রণা যুগের গ্লানি ও অপরিচ্ছন্নতা। কবিরা স্বাধীন তবু তারা শুধু মনোরঞ্জনের জন্যে কবিতা লেখেন না। যে সমাজে তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন যে আলো ও বাতাস তাঁকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলছে তার প্রতি তো তার কিছু দায় থেকেই যায়। তিনি যা বিশ্বাস করেন তার প্রতিও তার কিছু আনুগত্য থাকেই। তাই কবিতা রচনার প্রশ্নে এই স্বাধীন শব্দ প্রবাহ যদি সমগ্রের মনোরঞ্জনের উপভোগ্যতা পেয়ে যায় কবির কাব্যগুণে তাকেই তো সাফল্য বলা চলে। একটি সার্থক কবিতা রচনার মধ্যে যে রোমাঞ্চ থাকে তা অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। কবিতা লেখা আজ সব চেয়ে শ্রমসাধ্য সব চেয়ে কষ্টার্জিত। কবিতা লেখা যায় না, কবিতা নির্মাণ করতে হয়। একজন সার্থক কবি হাসিমুখে এই শ্রম বহন করেন বলেই বাংলাভাষা আজো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির অন্যতম এবং তাই নিয়ে আমরা কিছুটা গর্বিতও বটে।

কি অবস্থাতে আমি কবিতাগুলি লিখেছি সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে প্রাসঙ্গিকভাবে এই কথাগুলি বলে নিলাম এই জন্যে যে প্রত্যেকটি কবিতা রচনার পেছনে কবিকে লেখার চেয়ে ভাবতে হয় অনেক বেশি। আমার প্রত্যেকটি কবিতা উঠে এসেছে এক একটা ঘটনার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। আরোপিত কোনো বিষয় আমাকে কবিতা রচনার দিকে টেনে নিয়ে যায় না। যা দেখি যা ভাবি তাই অন্য ভাবে চলে আসে কবিতায়। যেমন ধরা যাক্ 'চিনতে না পারা' কবিতাটি–আজকাল কত তুচ্ছ ব্যাপার বিশাল আকার ধারণ করে। কারো কারো দশ পয়সার যোগ্যতা নেই অথচ এমনভাবে আমাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করে যে আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। তাদের নিয়ে আমাদের অনেকটা সময়ও কেটে যায়। অথচ কত জরুরী কাজ আমাদের করার থাকে আমরা তা করি না। এভাবেই আমরা এক একজন এক একজনের কাছ থেকে সরে যাচ্ছি। 'হিজিবিজি রাস্তার মুখে' কবিতাটির মধ্যেও একটা দেখার অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের আনন্দ উৎসব উপভোগ করতে গিয়ে প্রকৃতির কত সুন্দর পরিবেশ নষ্ট করছি। বন্য প্রাণীদের তাড়িয়ে দিচ্ছি তাদের বাসস্থান থেকে। একবারেও ভাবি না নিজেদের আনন্দের জন্যে আমরা প্রকৃতিকে প্রতিদিন কিভাবে লাঞ্ছিত করছি। 'মিঠুদের বাড়ি অবধি' কবিতাটিতে আমি আমার এক ধরণের বিশ্বাসের কথা বলতে চেয়েছি। এটা সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ যোগ্য কিনা জানি না, তবে আমার ক্ষেত্রে কখনো কখনো এমন হয়েছে যে একটা সীমানা পর্যন্ত ঠিক আছে, তার পরে আরো এগোলে কি রকম সব অঘটন ঘটতে থাকে। যাকে এড়িয়ে যেতে চাই তার সংগেই বারবার দেখা। আবার 'উনুনের চারপাশে' কবিতায় আমি বলতে চেয়েছি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। হিংসা হানাহানি এসবকে সমাজ থেকে নির্মূল করতে গেলে আমাদের অনেক করণীয় আছে। শুধু সাজানো মঞ্চে বক্তব্য রেখে হাততালি কুড়োলেই মানুষের থেকে হিংসা দূর হবে না। হিংসাকে তাড়াতে হলে

বিশ্বাস ও পরম মমতায় এখন জড়িয়ে ধরা চাই। ফাটলহীন এক মেলামেশায় আমরা যেন এ ওর বন্ধু হতে পারি।

মোটামুটি অভিজ্ঞতার এই সব জায়গা থেকেই কবিতাগুলির জন্ম। তবে এটাও ঠিক কবিতাগুলি যখন লিখেছিলাম তখনকার মানসিকতা বা চিন্তাভাবনার থেকে এখনকার চিন্তাভাবনার (মানে আজকের) কিছুটা তো ফারাক হয়েইছে। তখনকার যন্ত্রণার ছবি কয়েক মাস পরে কি নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে। একটা মোটামুটি ধারণার রূপরেখা টানার চেষ্টা করলাম এই আর কি।

With the best compliments from :

Phone : Chandpara—86

Gaighata Thana Agricultural Primary Marketing Co-operative Society Ltd.

P.O. CHANDPARA BAZAR
24 Parganas (N)

প্রতীকের জন্য

তোমার টেবিল জুড়ে একটিমাত্র উইল্‌সের প্যাকেট
দিব্যি পড়ে আছে খালি,—অন্তঃসারশূন্যতায় একা
এক সময় আমারও সঙ্গিনী ছিল ওই সুন্দরী মোহিনী
একটানা আসক্তি ছিল ঃ
হয়তো বা ক্ষুরধার নারী
যা পারে না, যা পারে না কিংবদন্তির তরবারি
তুমি তাই পেরেছিলে, বিজয়িনী, ঘন মেঘরেখা
আমার ফুস্‌ফুস্ আর মগজের কোষে আজও লেখা

তোমার বিজয়ধ্বজা হার্ট-অ্যাটাকে কিংবা ক্যানসারে
কুরে খায় রাত্রিদিন সব প্রেমেরই অশেষ মহিমা

কেউ রাজ্য জয় করে, কেউ আবার বিষাদ-প্রতিমা।।

দুটি কবিতা

এক।।
জলের 'পার্ল পেট' আছে, ঠিক যেমন ছিল
আধপেট ভর্তি জলে, অর্ধেক শূন্যতা ঃ
যা কিছু অর্ধেক আমি তার পক্ষে আছি

শুক্রবার যা হারালো, আজ তার পূর্ণতা।।

দুই।।
একটি সুটকেশ আর এক-ব্যাগ বই
হাত ও কাঁধের দ্বন্দ্ব অক্ষরে-অক্ষরে
গড়ে ওঠে ঃ আমি মাত্র দূরের দর্শক

বিজড়িত উদাসীন, ঘর নেই ঘরে।।

'আমি' কে? আমি কে,—এই প্রশ্নের যেমন মীমাংসা আছে তেমনি আবার নেইও। মীমাংসার সূত্র মেলে যখন আমার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি তুলে ধরা যায়। এতে যে সূত্রটি মেলে তাতে বহু কিছু স্পষ্টও আবার হয় না। সেক্ষেত্রে, আমার একটি ফটো থাকলে আরও খানিকটা স্পষ্ট হয়। কিন্তু, এতেও মুশকিল হয় আমার চরিত্র নিয়ে। কারণ, ফটো দেখে কোনে কোনো বিজ্ঞজন আমার স্বভাবের একটি রূপরেখা উপলব্ধি করলেও এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। আমাদের জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা এই ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলে প্রমাণিত করে দেয়। আর, যা যা অমীমাংসিত থেকে যায় তার পরিমাণ এত বেশি যে এক এক সময় মনে হয়—এই অমীমাংসিত আমিই প্রকৃত আমি।

আমার বাড়ি যাবার পথে একটি ছোট্ট দোকান আছে। দোকানটি ছোট হলেও এ এক বিচিত্র জিনিস বলে আমার একদিন মনে হয়েছিল। মানে, দোকানটিকে আমি রোজই দেখি। জিনিসপত্তর কিনি। মালিকের সঙ্গেও মাঝে মাঝে কথা বলি। কিন্তু, কোনোদিনই এর স্বাভাবিকতা আমার কাছে অস্বাভাবিকতায় হাজির হয়নি। অর্থাৎ, এর অমীমাংসিত রূপ আমি বুঝতে পারিনি। একদিন, বেশ রাত হয়েছে, দুলে দুলে বৃষ্টি হচ্ছে চতুর্দিকে ; ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষজন ; বৃষ্টির ছাঁট আসবে বলে আশপাশের বাড়িগুলির সমস্ত জানালা বন্ধ। এজাতীয় সময়ে বরাবরই আমার একটু বাইরে বেরোবার অপ্রতিরোধ্য একটা টান কাজ করে। আমার অমীমাংসিত রূপই হল এটা। ফলে, আমি বলতে পারবো না কেন এমনটা হয়।

তো, একটা ছাতা নিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। বাইরে বেরোতে আমি কোনো পোশাক পরিবর্তন করিনি। কারণ, এই রাতে, পথে যখন কোনো মানুষজন থাকার সম্ভাবনা নেই, উপরন্তু বৃষ্টির যা মেজাজ তা ভিজে যাবো ছাতা নিয়েও, এ আমি জানতাম। ফলে, আমার দেহের নিচের দিকে লুঙিই সার ; উপরের দিকটা উন্মুক্তই রইল। থাক্, কী আর হবে—এরকম ভেবে আমি দরজা খুলে বাইরে থেকে তালা লাগালাম। ঘরে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা কেউ কিছু টের পেল না।

সদর দরজা খুলে বাইরে পা রাখতেই দেখি মামা এই বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে ছুটতে এসে আমার গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়াল। মামা মানে এখানকার সমস্ত কুকুরদের অভিভাবক সে। এবং সে যে মামা তার কারণ, তাকে কেউ কোনোদিন এ অঞ্চলের কুকুরীদের সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে দেখেনি। কুকুর কুকুরী এ অঞ্চলের সবাই তাকে যে মান্যগণ্য করে তা বেশ বোঝা যায়। বললাম, 'আমি রে, চোরটোর নেই।'

শুনে ও খুশি হল। কিন্তু, আমার এই প্রকার সাজপোশাক দেখে ওর একটু সন্দেহ হল যে তা বোঝা গেল ওর নাক কুঁচকোনো দেখে। কিন্তু, ও দাঁড়াল না। চলে গেল বৃষ্টির মধ্যে। একটু কষ্ট হল আমার।

ধীরে ধীরে হেঁটে আমি দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালাম এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলাম-দোকানটার ঝাঁপ তখনও বন্ধ হয় নি; ভিতরের আলোও নেভেনি।

প্রথমটায় আমার মনে হল, দোকানটা যে খোলা রয়েছে এতে খুব সুবিধে হল। এখন এখানে দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে কড়া একটা সিগারেট খেতে খুবই ভালো লাগবে।

রাস্তার ওপাশে দোকানটি। আমাকে যেতে হলে রাস্তা ডিঙোতে হবে। এই রাতে রাস্তা পার হওয়া কোনো সমস্যা নয়। উপরন্তু, এ রাস্তাটি দিনের বেলায়ও খুব যে ব্যস্ত তা নয়। এ হল পাড়ার

ভিতরের রাস্তা, প্রাইভেট কার, সাইকেল-রিক্‌শা ইত্যাদি চলাচলের জন্যেই এ'।

কিন্তু, অস্বাভাবিক বৃষ্টির দরুণ পথে বেশ জল। জলে স্রোতও আছে। স্রোতের সঙ্গে এই অন্ধকারেও দেখছি বহুকিছু ভেসে চলেছে।

বেশ একটু ঠান্ডা অনুভূত হল জল ডিঙোতে। বেশ ঘন জল।

একেবারে মুখোমুখি দোকানটা। দোকানের ঝাঁপ বাঁচিয়ে ছাতা হেলিয়ে নিয়ে আমি বললাম, 'জগদীশ, একটা সিগারেট দাও।'

দোকানটা বেশ উঁচু। চারটে উঁচু পায়ার উপর দাঁড়িয়ে। অস্থায়িত্বের লক্ষণ। ভিৎ গেঁথে ঘর তৈরী নয়। পরিসরে খুবই ছোট। সামনের দিকে পর পর বয়াম ভর্তি নানারকম লজেন্স। বাঁ-দিকে ঠান্ডা বক্সে কোল্ড ড্রিংকস। উপরে তারের ঝুড়িতে ডিম। এছাড়াও নানানরকম সামগ্রীতে ঠাসা দোকানটি। সারাক্ষণ ভিড় লেগেই থাকে। জগদীশ মানে দোকানের মালিক বসে মাঝখানটায়। বয়াম ও দ্রব্যসামগ্রী ছাড়িয়ে তাকে দেখা যায়।

সে ওখানেই আছে এবং যে অবস্থায় তাকে প্রতিদিন দেখি সেই অবস্থায়ই সে আছে এমত বিশ্বাসেই সিগারেট চেয়েছিলাম তার কাছে। কিন্তু, সাড়া পেলাম না। সিগারেট যে পেলাম না তা তো বলাই বাহুল্য।

দেখলাম—জগদীশ যেখানটায় বসে সেখানে স্ট্যান্ডের উপর একটা আলো জ্বলছে, যা আমার অভিজ্ঞতায় একেবারেই অভিনব। কারণ, এ দোকানে আলো জ্বলে চালের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায়। দু'পাশে দুটো আলো জ্বলে। সামনে আর একটা। কোণের দিকে ছোট্ট একটা টেবলফ্যান বেশ আওয়াজ করে ঘোরে। এই আওয়াজ মাঝে মাঝে এত বাড়ে যে ওর সঙ্গে কথা বলতে বেশ চেঁচাতে হয়।

ফ্যানটা এখনও ঘুরছে ; তবে শব্দটায় তেমন জোর নেই। কিন্তু, বৃষ্টির শব্দ প্রখর। সঙ্গে হাওয়ার হু হু। চারিদিকে তাকিয়ে আমি জগদীশকে খুঁজলাম। কিন্তু, কোথাও দেখলাম না। এমন কি পেছনের দিকেও তাকালাম একবার। অবশ্য এর পেছনে কোনো যুক্তি ছিল না। দুঃখ বোধ হল আমার। কেউ যদি বলেন, এ অবস্থায় ভয় বা বিস্ময় বোধ হওয়াই তো উচিত ; দুঃখ বোধ কেন? —একথার উত্তর আমি দিতে পারবো না। সম্ভবতঃ এই বৃষ্টির ভুবনে নিঃসঙ্গ একটি দোকান, এই-ই বোধ হয় দুঃখের কারণ। তবে, এটুকু আমারও কল্পনা। আমি নিজেও যে সুনিশ্চিত তা নয়।

আমার নিজের দিকে আমি তাকালাম। দেখতে চাইলাম। যতটুকু যা দেখা যায় দেখলাম বলেই মনে হল। আমার নিজের সঙ্গে দোকানটির একটা সামঞ্জস্য দেখতে পেলাম। আমারও এরকম ঝাঁপ খোলা। কিন্তু, এর মধ্যে আমি যে কোথায় তা আমিও জানি না। পার্থক্য এটুকু যে আমি ক্রেতা মাত্র।

আমার যে একটা সিগারেট দরকার। দরকার এজন্যে যে এই পরিবেশের মধ্যে নিজেকে আমি ঠিক মেলাতে পারছি না। একটা সিগারেট টানতে পারলে সুনিশ্চিতভাবেই একটু সামাল দিতে পারতাম। কিন্তু, আমার নাগালের মধ্যে থাকলেও আমি হাত দিয়ে নিজে সিগারেটটা নিতে পারছি না। এবং এই বাধার ব্যাপারটা আমরা জানলেও এর স্ব-রূপ আমরা জানি না।

মাঝে মাঝেই আমি আজকাল নিজেকে ছাড়িয়ে যাই। আজকের এই পরিবেশে ঘর থেকে বেরিয়ে আসাও এই জাতীয় একটি ভূমিকা। আমি নিজেই হাত বাড়িয়ে আমার প্রিয় ব্রান্ডের প্যাকেটটি ছুঁই।

কিন্তু, কী যেন একটা দংশন টের পাই। ঝন করে ওঠে।

মুহূর্তে হাত সরিয়ে নিয়ে আসি। চোখের সামনে হাতখানা মেলে ধরি। দংশনের স্থানে দেখি একটি মৌমাছি।

ডান হাত এগিয়ে দিয়েছিলাম। বাঁ-হাত দিয়ে মৌমাছিটাকে সরাতে গিয়ে দেখি, আমার হাতে আরও আরও সব মৌমাছিরা এসে বসেছে। এঁরা কেউ দংশাচ্ছেন না। বসেছেন মাত্র।

এ এক অভাবনীয় দৃশ্যই বটে। আমি ভাবি—চাক বাঁধবে না তো!

চাক বাঁধলে কি খুশি হই আমি?

কিন্তু, অন্য মৌমাছিগুলি উড়ে গেল। একটিই দংশন করল, অন্য কেউ নয়। সাপেরও শুনেছি এই নিয়ম—দুটো সাপ একত্রে থাকলেও একজনের বেশি দংশন করে না।

'তুমি এখানে কি করছো?'

বহুক্ষণের মধ্যে এই প্রথম মানুষের কণ্ঠস্বরে আমি চমকে উঠলাম।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি—আমার স্ত্রী।

'একটা সিগারেট কিনতে—'

'এই রাত্তিরে সিগারেট কিনতে?'

'খুব ইচ্ছে হল কিনা.....তাই।'

'এখন কোনো দোকান খোলা থাকে?'

'এই তো খোলা রয়েছে।'

'তোমার মুন্ডু! কোথায় খোলা!'

দু'জনের দেখার মধ্যে এই পার্থক্য নিয়ে বিতর্ক চলে না। বিশেষ করে এই রাত্রি তাতে বৃষ্টিপাত। আমি বললাম, 'খোলা নেই নাকি?'

একথার উত্তর না দিয়ে সে তার ডানহাতখানি বাড়িয়ে ধরল। এমনটা সচরাচর ঘটে না। ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার পর থেকে আমরা হাতে হাত রেখেছি, এমন হয়নি। ফলে, ব্যাপারটি আমার কাছে দুর্লভ মনে হল। আনন্দে আমিও হাত বাড়িয়ে দেবার আগে আমার সন্দেহ হল—এখনও কি অবশিষ্টে কিছু জমা হয়ে আছে!

'সিগারেট নিলে না?'

'কি করে নেবো?'

'খুব ভালো হল, এবার তুমি সিগারেট ছাড়তে পারলে।'

'ছাড়লাম না কি?'

'বোধ হয়।'

বাড়ি ফিরে এলাম। সুস্থাদুভাবে ফিরে এলাম। আমরা দু'ঘরে যে যার বিছানায় গিয়ে শুলাম। ঘুমিয়েও পড়লাম।

পরদিন সকালে টেবলে একসঙ্গে বসে চা খেতে খেতে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, 'আমাদের একটা যে গ্রামোফোন ছিল, কোথায় সেটা?'

'ক-বে নষ্ট হয়ে গেছে!'

'রেকর্ডগুলো?'

'ফেটে বেঁকে ছিল, ফেলে দিয়েছি।'

'মণি কলেজ গেছে?'

'অনেকক্ষণ।'
'জয়ন্ত খেলতে গেল না?'
'পায়ে লেগেছে, যাবে না আজ।'
'বাজারে যেতে হবে তো?'
'মনে করে একটা তরমুজ এনো তো!'
'কী রোদ্দুর!'
'এবছর কালবোশেখী হল না।'
'কল্পনাদির আজ কাজ।'
'একবার যেয়ো।'
'তুমি?'
'আমাকে বাদ দাও।'
সংসার নিয়ম মতো চলতে থাকে।

With the best compliments from :

Phone : 03462-55445

Birbhum Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Ltd.

P.O. SIURI
Dist. BIRBHUM

G. S. BANERJEE
Chairman

একলব্যা ❐ কবিতা সিংহ

তোমাকে তো বহুদিন বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেছি
মানুষের মধ্যে নয় নারী।
নারী গণ্য নয় প্রেমে, ত্যাগে করুণায়
নারী গণ্য নয় শিল্পে, অমর্ত সৃজনে!

নারীর জন্য ঘাম, রক্ত, শ্রম, বিয়োনো, ধকল
নারীর জন্য এই পৃথিবীতে ঠুনকো নকল
শুধু চালু
তবে কেন কষ্ট পাও? তবে কেন কবিতায় গ্রস্ত হয়ে ওঠো
কেবল উঠতে চাও
উঠে যেতে যেতে নারী-পতনের শব্দ শোনোনা কখনো
দেখোনা নিম্নশির রমণী-ঝরণ?

মানুষের মধ্যে নয় নারী, তাই,— নারী এক অব-মানবিকা!
কেন তুমি 'অব' শব্দ কেটে দাও বসাও অন্য শব্দ — 'অতি'!
কেন তুমি একা ছন্নমতি
ভিড়ের মধ্য থেকে উল্টো দিকে যাও, বানাও কবিতা

কবিতা নিজেই এক নারীশব্দ
কিন্তু কবি নয়।
নারীরা মানুষী কিন্তু নয় তারা মানুষ — পুরুষ
নারীরা তো কবি নয় নারীরা তো কেবলি কবিতা

নারীদের কবিতা বানানো
এ দেশে নিষিদ্ধ কাজ—কাজ নেই তাই সিদ্ধতায়
একলব্যা হয়ে যাও—বুকে রাখো চুপি চুপি বুকে
কবিতাকে আঙুলে এন না।

হাঁস ❐ দেবারতি মিত্র

এতদিনকার সাঁতারের কৌশল ভুলে
খুব হাকপাঁক করে
শূন্যি পুকুরের হাঁস ডুবে যাচ্ছিল।
নিঝুম দুপুরবেলা মনেও পড়েনি তার
বিকেলে সূর্য ডুববে, রাত হলে চাঁদ,
এখনও তো তালগাছের ছায়া
মাথা অবধি জলের তলায়। এসবই ক্ষণিক।

হাঁসটি তো পাপে তাপে শোচনায় বিভ্রমে
এতখানি ভারী,
পড়ন্ত বেলায় তার জলে ডুবে যেতে যেতে
মনে হল—
কিছু শেখবার নেই, কিছু ভাববার,
বাকি নেই কিছুই হবার।
মাটির হাঁস সে, তার গা থেকে কেবল মাটি
মাটি গলে গলে এই একভাগ স্থল।
চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে
সমুদ্র না, মেঘমায়া নয়,
শুধু অসংলগ্ন ছল, শুধু সাময়িক ছায়া।

আমাদের বুড়ো হওয়া ❐ বাসুদেব দেব

রাংতায় মোড়া আত্ম অহমিকা
এখন পথের ধুলোয় খেলে বেড়াচ্ছে বেওয়ারিশ
মানুষের থেকেও বড় হয়ে ওঠা বেগনি শিলমোহর
এখন বাতিল দেরাজে ঘুমুচ্ছে আরশোলাদের সঙ্গে
এই তো সময়, এসো চাঁদ, এসো মেঘ মহিমা
জামাজুতো খুলে এসো, ফেরিঘাটে
এখনি উৎসব শুরু হবে

অন্ধকারে ফুটছে স্পর্শ, সাদা ফুল
শব্দগুলো খুলছে খোলস
জীবন মৃত্যু ভালোবাসা, রহস্য মাখানো উত্তেজনা
জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে শীতল পাটিতে
গ্রামশেষের নির্জনে তেঁতুল গাছের ছায়ায়

চৌকাঠের ওপর আলপনার মতো খেলা করছে জ্যোৎস্না
আর জ্যোৎস্নায় জড়ানো শ্বেত সেই শঙ্খচূড়

শোনো সরলতা ❐ মতি মুখোপাধ্যায়

আলতা পরা পায়ে তুমি ঘুঙুর বেঁধেছো
দুলে দুলে রাজহাঁস, লীলাময় দলবৃত্তে হাঁটো
যাও সরলতা
রূপরঙ্গ জীবনের যেখানে যা আছে দেখে নিয়ো
ভুল করে যেন
কখনো যেয়ো না তুমি স্নেহময় বয়স্কের কাছে।

বিষফল খেতে ওরা একদিন বনে গিয়েছিল
ফিরে এসে মাননীয়
জুমলেন্সে মুখোমুখি বসে আছে প্রথম সারিতে
আবৃত যৌনতা
চারুবাক মহার্ঘ পুরুষ
শ্রদ্ধেয় সম্বোধনে প্রতিদিন ডাকবাক্স ভরে রাখে চিঠি।

পড়ে নিয়ো কথামালা
বয়স্ক বাঘেরা কেন নেকলেস হাতে
প্রেম-সিক্ত কণ্ঠে ডাকে, এসো
বরং কুটিল হোক, হে বালিকা
তোমার সরল চোখে স্বপ্নময় দুই কনীনিকা।

কি যেন নেই ❐ সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

কি যেন নেই – দার্জিলিঙে শীত,
কি যেন নেই – কেমন যেন হাওয়া,
কি যেন নেই – কাঁপিয়ে তোলে ভিত্,
কি যেন নেই — কি যেন ছিল চাওয়া।

কি যেন নেই, কোথাও বুঝি আছে,
কি যেন নেই, কি যেন খুঁজে যাওয়া,
কি যেন নেই, কি যেন ছিল কাছে,
কি যেন নেই, কি যেন নয়-পাওয়া।

কি যেন নেই, মনে পড়ানো কথা,
কি যেন নেই, মনে পড়ানো সুখ,
কি যেন নেই, কি যেন নীরবতা,
কি যেন নেই, কি জানি কোন মুখ।

কি যেন নেই, কিসের যেন ছোঁয়া,
কি যেন নেই, কি যেন গেছে খোয়া,
কি যেন নেই, নেই-নেই-নেই-হাওয়া,
কি যেন নেই, কি যেন ফিরে পাওয়া।

দার্জিলিঙে হারানো কোলকাতা,
পথের ওপর ঠান্ডা চিঠির পাতা।।

যদি যাই ❐ কালীপদ কোঙার

যেতে পারি, না-ও যেতে পারি
হুপ করে যেতে পারি, ঝুপ করে নেমে আসতে পারি
সহজ এ যাতায়াত, জলভাত, সকলেই জানে।
আমি শুধু বলতে চাই
যাবো কিন্তু সহজে যাবো না –
যাবার সময় ভেঙে দিয়ে যাবো
অন্ততঃ কয়েকটা বুক, বুকের পাঁজর।
অনেকে পোষাক চেনে, মানুষ চেনে না
অনেকে মুখোশ চেনে জানে নাকো মুখের হদিশ
এরকম মানুষরা কষ্ট পাবে, অবশ্যই পাবে।

স্বপ্না ও নিন্দুক ❐ বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

পোষাক পালটানোর ফাঁকে আয়নায় তোমার মুখ
দেখামাত্র একপাক ঘুরে 'ভালো আছো' বলি ;
ভালো থাকা মানে যদি এই ঃ রাত্তির ন'টার বন্ধুকে
হঠাৎ ঘড়ির থেকে চোখ তুলে আদেশের সুরে
'বাড়ি যাবো' বলা, আর বলামাত্র সেও, নিমেষে এগিয়ে দিচ্ছে
(পুরো ভাড়া আগেই মিটিয়ে) অজানা ট্যাক্সির দিকে.....
যার মানে, কাল কথা হ'বে টেলিফোনে –

কেন যে পার না তুমি অসম্ভব বাজি ধরে
বিনিময়ে আত্মঘাতী হ'তে?
আমিও পারিনা, তাই দরজায় হাত রেখে তোমাকে বলেছি,
আজ ব্যস্ত আছি, শোনো ; মানে ফিরে যাও!
আসলে চেয়েছি তুমি ধাক্কা মেরে ঘরে ঢোকো,
দূর করো অবাস্তব তাকে,
কিছুই পারো না তুমি -- ভয়ে ভয়ে বেজে ওঠে বেল
আর হেসে খুন হয় যত পাড়ার নিন্দুকে।

নীরবতার আগে ❐ অমিতাভ কাঞ্জিলাল

আলো নিভে আসছে দ্রুত, আর নিবিড় সন্ধ্যেবেলা
আমি ফিরে যাচ্ছি জানালার দিকে
গত কয়েক বছরের আমার একমাত্র ঠিকানায়
স্বপ্নগুলো যেখান থেকে মিলিয়ে যেতে দেখেছিলাম আমি
কান্নাগুলো ছড়িয়ে পড়তে
দু'একটা মুখ হয়তো বিস্ময়ে থমকে গেছিলো কয়েক মিনিট
তারপর শুধু মেঘ, শুধু অন্ধকার
শুধু বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝরে পড়তো মাথার এককোণে

এখন স্তব্ধ কারখানার ভেতর বেজে উঠছে এক বিশাল ঘন্টা
রহস্যময় একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে এয়ারপোর্টের দিকে
কবিতার শব্দগুলো এখন ঠাট্টা ক'রছে আমায়
চিঠিগুলো ভাসতে ভাসতে আজ কোথায় পৌঁছেছে—কার হাতে
কিছুই জানি না!
শুধু জানালাটা বন্ধ হ'তে হ'তে ছোটো হ'য়ে আসছে ক্রমশ.....

তোমরা কি দশ পর্যন্ত গুনতে পারো? ❐ সুব্রত সরকার

আজ এথেল রোজেনবার্গ ও তার স্বামীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।
রোজেনবার্গরা বিখ্যাত কেউ ছিলেন না, শুধু
তাদের অবর্তমানে তিনটি বাচ্চা অনাথ হয়ে পড়লো, কিন্তু কি করা যাবে?
ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পরমাণু শক্তির তথ্য বিদেশে পাচার করার,
সরকারের উপায় কি? যদিও অপরাধ প্রমাণিত হয়নি
তবু ফাঁসি কি কেবল অপরাধীদেরই দেওয়া হয়? দেশ যাদের চালাতে হয়, যাদের
লোকেদের ধার্মিক রাখা কর্তব্য—সময়ে তাদের কঠিন হতে হয়।
বিকাশশীল পুঁজি, তার উন্নয়ন, রক্ষা সর্বোপরি নিজেদের কল্যাণে
এমন ঘটনা ঘটতেই পারে।

রোজেনবার্গ দম্পতি প্রাণভিক্ষা চাননি, শুধু বলেছিলেন—
তারা নিরপরাধ। এমন কি অপরাধ স্বীকার করলে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে
যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া হতো। তারা প্রত্যাখ্যান করেন সে প্রস্তাব।
অতএব জীবন দিয়ে তাদের সত্যকে রক্ষা করতে হলো।

কিন্তু কি হবে ঐ রোজেনবার্গের শিশুদের? স্ত্রী-র প্রশ্নে শঙ্কর
চুপ করে থাকে। একটু আগে খবরের কাগজ পড়ে ও সব জানিয়েছে তাকে।
আঙুর পাতার মতো গাঢ় সবুজ সন্ধ্যা যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠলো।
কোথায় আমেরিকা আর কোথায় ভারতবর্ষ। শঙ্করের
বাচ্চারা টেবিলে পড়াশুনো করছিলো আর প্রতিদিন যা করে—খুটি পটি
তাও, হঠাৎ রঞ্জন বলে বাবা ওদের এখানে চলে আসতে চিঠি দিয়ে দাও।
দেবী বললো ঃ ওরা আমাদের সঙ্গে স্কুলে যাবে, আমি ওদের
দশ পর্যন্ত গুনতে শিখিয়ে দেবো—ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর.....

ওয়াল স্ট্রীটের ব্রোকার তোমরা কি দশ পর্যন্ত গুণতে পারো?
তাহলে এখন থেকে গুনতে শুরু কর—শ' পর্যন্ত? লাখ পর্যন্ত, কোটি?
গুনতে থাকো, পৃথিবীর কোটি কোটি শিশু রোজেনবার্গের ছেলেদের সঙ্গে
আজ রাত থেকে এক হয়ে গেছে। কত লোককে ফাঁসি দেবে তোমরা?
কত রকমের অভিযোগ বানাতে পারো আমরা দেখতে চাই?
বিবেকহীন কত অনুগামী তোমাদের রয়েছে? স্পেনের
ইনকুইজিশান থেকে আজকের এই বৈদ্যুতিক ফাঁসি গুনে যাও, আমরা আসছি।

[* কৃষাণ চন্দের একটি গল্প অবলম্বনে]

প্রত্যাবর্তন ❐ নির্মল বসাক

অনেক উঠেছি নাড়ু ও মোয়া থেকে।
সিঙ্গারা-কচুরী, চপ-কাটলেট, চিকেন-তন্দুরিতে ;
কখনো জিরা-রাইস, কখনো ফ্রাইড বা
চিলি-ফিস-ডিস কখনো সাজিয়েছি।

অনেক স্যুপটুপ, পরিজ প্যাসট্রি,
প্যাটিস কেক দিয়ে জন্মদিনে মোম
ফুঁ-দিয়ে নিভিয়ে ফুলের জলসায়
গোলাপে ট্যুলিপে রূপজ বন্দী।

হে বেলি, মালতী বা টগর-মনীষা
সাদা পতাকার পাপড়িতে জানি মুক্তি।
তা হলে বলে ফেলি—পান্তা ভাতে দাও
কাঁচালঙ্কা ঝাল, কিঞ্চিৎ কাসুন্দিও
লুঙ্গি গুটিয়ে, গুটিয়ে আস্তিন সারবো প্রাতঃরাশ
মায়ের-গন্ধ-মাখা পেঁয়াজী-বেগুনিতে।

স্বপ্ন নেই আর ; স্মৃতিতে এসো হে হাওয়ায় উঠে আসা
কে তুমি হাহাকার.....

ক্লেদজয় ❐ গৌতম চট্টোপাধ্যায়

শতকের ময়ূর নাচছে তার মাথা জুড়ে।
বৃষ্টি বহুমুখী প্রশ্নের তাঁবু বিছিয়ে দিল।
সহসা শিরোনাম পেলে বন্ধুরা উত্তরীয় কাঁধে
যুগল জুতোকে অবিশ্বাস্য আয়না করে চলে আসে।
এখনও.....এখনও.....এখনও কত সর্পপ থেকে
ঝাঁঝাল তেল ব্যক্তিগত কোষাগারে জমে যায়।

তার গ্রহণ ক্ষমতা.....ধরিত্রী জিভে নিয়ে স্বীকার করি,
সামান্য শ্মশ্রু ও কুটিল দৃষ্টি দেখে বোঝা যায়নি।
তবুও, দৈবী অক্ষর নয়.....অল্পমূল্যে কেনা বালকের দল
আঙুলের ঈষৎ নির্দেশে কাপড় খুলে সহস্রধারায় বয়ে যেতে থাকে।

এখনও.....এখনও.....এখনও প্রভু সে জলকে অপেক্ষা করাতে জানেন।

সবুজ ডিম সংক্রান্ত ❐ মানস কুমার চিনি

আবার আকাশের জল ঝরে পড়লো
প্রতিষ্ঠিত গাছের উপর। তখন বিনিময় করছি
পাখিদের ডাক, পালকবীজ
আর গাছে গাছে তৈরী হচ্ছে সবুজ ডিম.....

আলো ডুবিয়ে ডুবিয়ে তারা বিষয় বস্তু থেকে
তৈরী করছে ঘন্টার শব্দ, সব টিকটিকির হঠাৎ
জলে পড়ার কাহিনী তখন একপিঠে
ভেসে থাকে বাতিল হাওয়া

এই বুদ্ বুদ্ জল মিশে যাওয়ার আগে দেখছি
সতর্ক পাহারা দিচ্ছে লাইফবোট, সব টুকরো টুকরো
জলের ঝিলিক তৈরী হচ্ছে সবুজ ডিম.....

উপস্থিত ❐ অর্ঘ্য মন্ডল

হট চলমান কোনো জানলাকে তোমার প্রণয়াভাসে উপস্থিত করা
খাদ ও পাহাড় কল্পময় কেউ পালন না করতেই পারে
ভয় ও স্খলন ঘোরাফেরা দিকে প্রতিশ্রুতি মনে হচ্ছে
ফুরফুরে নিশিবদ্ধুতা। আবর্তন আগলে যদি
মনের প্রকৃত কাছে আমি একটু ঢেউ। আমি একটু রঙচটা—
অগ্ন্যুৎপাত যদি সহরুগিনীর সন্ধি মেনে
চক্রান্তে অপেক্ষা করি, আর
বনমহুয়া ফুলেরা
রঙকে বিরুদ্ধ করে সরাসরি সংঘাতে নেমেছে ; যদি তোমার প্রণয়াভাসে
হট চলমান আমি, তবে নিউটনের গতিসূত্র মতে
বাইরে থেকে প্রযুক্ত বল দ্বারা আঘাত পেলাম।

এই তো সময় ❐ আশুতোষ গোস্বামী

১. পথে যেতে দেখা লঘুভার মেঘে
রূপোসী সকাল আগত প্রত—
জাহাজ-ঘাটার বাঁশির ধ্বনিতে
আকাশি আগুনে কুয়াশা গত
এবং প্রভাতী গানের বাসর
দূরদর্শনে জাগায় সাড়া
নতুন দিনের সংবাদ-বহ
চেতনায় সুর দিয়েছে নাড়া ;
বেলা বাড়ে ক্রমে রবি সঙ্গীতে
জন কোলাহলে কাজের তাড়া
মুখর দিনের গর্জন ভাঙে
জনতা মিছিলে অজস্র ধারা।

২. এলো সকাল টাকশাল থেকে
টাটকা খোলা টাকার মত ঝক্‌মকে
পথে পথে বিচিত্র বিপণি যেন
সাজাবো ফুলের তোড়া—আর তাতে
উপচে পড়ে মৌমাছি তেমনি গুঞ্জন
আর মধুরসের ব্যস্ত আহরণ ;
দেবতার মুখের আদলে তাদের
ঈষৎ হাসি জেগে আছে শান্ত ঠোঁটে
চোখে ওদের গীতাঞ্জলির আলো,
ওরা পরস্পর বিশ্বাসের মুদ্রা
বদল ক'রে নিচ্ছে অলিখিত দলিলে ;
পথগুলো শক্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে, মসৃণ ঋজু বিস্তার ;
ক্বচিৎ কুটিল চোখের বক্রদৃষ্টি
সরে সরে যাচ্ছে কানাগলির বাঁকে।

৩. অনলে অনলে পরাস্ত আকাশ
সীমাহীন দেশকাল অদিতির বুকে
মারে খর তীর, পাণ্ডুর মুখাভাস ;
অনেক মনীষা করেছে প্রসব
সান্ত্বনা তাই নীল নিশ্চল ঠোঁটে
নইলে মরণ ভালই ছিল জান্তব দাপটে।

অশ্রুধারায় নম্র ললিত আভা
শস্য প্রসবা স্বাদুতায় ভরাতুরা
দিনের আকাঙ্খা নিয়েছে রূপ
স্বর্গের পারিজাতে।

এই তো সময় সাধ্যসাধন গীত
ঘামে আর শ্রমে তাই বুনে চলে
বৃদ্ধগরিমা মন্ত্রবীজে স্বর্ণশস্যকণা
উপনীত মৃৎপাত্রে ; রৌদ্রদগ্ধ সম্মিলন
অভিলাষী মানুষের ; অশ্রুস্বেদে সিক্ত মাটিতে
সুগন্ধ আঘ্রাণে জন্ম নেবেই প্রজ্ঞার ফল
আলোকোজ্জ্বল ফসল ; প্রেম ভুলেছিল
কবিতার ভাষা তার, এখন বেজেছে ঘন্টা
জেগেছে জাতিস্মর গহন আত্মা আঁধারে।

অপেক্ষায় আছি ❐ আশিস মন্ডল

সেই পড়ন্ত বিকেলে এসেছো তুমি
এখন শেষ হয়নি কথা, সংসারের
শেষ নেই, জানো না বলেই আবেগে
একের পর এক বলে যাচ্ছে ঘটনা—
সংক্ষিপ্ত নয় কোনো ঘটনা, তার রেশ থাকে
তাকে নিয়ে খেলায় মাতে সময়, কিছু বলে,
বুঝলে এত শ্যাওলা জমত না ঘরে।

বাইরে ঝিরঝির করে পড়ছে অন্ধকার
টুপটাপ নামছে রহস্যঘন জীবনের বিস্তার
অস্থির হয়ে শুনছি আর বিদায়ী মনে প্রার্থনা করছি
তোমার প্রস্থান, বলতে পারছি না, বাড়ি যাও
সংসার কখনো শেষ কথা বলে না।

তুমি উঠলেই উঠবো আমি, নিজের হাতে বন্ধ করবো দরজা
তারপর মহাশূন্যের কাছে বসে শুনবো
নিঃশব্দের গান।

পঁচিশে বৈশাখের একটি কবিতা ❐ মঞ্জুভাষ মিত্র

'ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে'
রবীন্দ্রনাথ

মাঠ জোড়া আকন্দের ফুল দেখে দেখে
তোমাকে রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ে গেছে
হালকা বেগনী রঙ আনমনা উদাসীন
বনফুল ছুঁয়ে হাসে চৈত্র রঙীন
আমার বুকের ভিতর উচ্চাকাঙ্খা তোলে কণ্ঠস্বর
মানব জন্মের ঘরে কি পেয়েছি কি চেয়েছি আমি
কিছু স্বপ্ন ফলে ওঠে কিছু স্বপ্ন ঝরে যায়
চলতি পায়ের পথে কত দুর্বাঘাস
দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হৃদয়কে ; অনুপমতায়
এখানে ওখানে কিছু রোমান্টিক ফুল ফুটে উঠে
হঠাৎ তোমার কথা মনে আনে ; আনন্দকে পাবে ব'লে
তুমিও কি যাওনি সেদিন দুঃখের পথে চলে?

তেন্ডুলকরের ব্যাট, লিরিক কবিতা ❐ মঞ্জুভাষ মিত্র

শচীন তেন্ডুলকরের ব্যাটিং ঠিক যেন লিরিক কবিতা
সূক্ষ্ম সাংগীতিক এক সুমধুর আভাসময়তায়
ব্যাট থেকে কত বল মুহূর্তে ঝলসে উঠে বাউন্ডারী পার হয়ে যায়
ষ্ট্রেট ড্রাইভ আর অন্ ড্রাইভের ভিতর ঠিকরে পড়ে সম্রাটের উদ্ধত মহিমা
হাতের উইলো দিয়ে বিশ্ব যেন করবে শাসন
আক্রম, অ্যামব্রোজ, ইউনিস, ওয়ালস, ম্যাকডারমট কি চামুন্ডা ত্রাস
বিশ্বজোড়া সব ফাস্ট বোলারের হয়ে উঠল ত্রাস
আর পায়ের নির্ভুল কাজে ওয়ার্ন, মুস্তাক, মুরলীধরণ
ইত্যাদি স্পিনারদের বল উইকেটের চারপাশে চকিতে পাঠায়
এসব মুহূর্তে শচীনের ব্যাট যেন একশোটি দেবদূত গান গায়
সব কাজ ফেলে রেখে রঙীন টিভির পর্দায় চোখ রাখি
রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপীয়ার পাঠের মত এই কাজও মনে হয় ভীষণ জরুরী
গান শোনা, ঘোরাঘুরি, লেখালেখি, লাইব্রেরী এ সময় সব কিছু বন্ধ রাখতে পারি
অল্প কিছুদিন আগে যে ছিল কিশোর
বছরে আজকে তার আয় কোটি টাকা, রূপবতী অঞ্জলির পতি
ব্যাট হাতে তাকে দেখলে মনে হয়
সৌন্দর্যতত্ত্বের কোনো বইয়ের
পাতার থেকে সম্প্রতি উঠে এল বুঝি

এই পার্ক ❐ দেবী রায়

তুখোড় এই পার্ক, এখন একা।
এতোক্ষণ কলকল করছিলো
দেখা—
সাক্ষাৎ পরস্পরে!

ফিরে গেছে আশপাশে
কেউ নেই! শেষ অব্দি কেউ-ই থাকে না—
থাকে শুধু গাঢ় অন্ধকার। সারি সারি বৃক্ষেরা
কখনও নিশ্চুপ, কখনও বা উদ্দাম।
আকাশে অস্পষ্ট ভাঙ্গা-চাঁদ!

খুশীর বার্তা ছড়াতে, অলকাপুরীর মেঘ
নেমে আসে। মর্মভেদী বাতাস কি বলে
যায়, কান পেতে শোনো ঃ

'নয় এ প্রতীক্ষা—
নিরবধি কালের, এ জীবন-ও নয় অ-ফুরাণ'!

ও ফুলবাগান ❐ দেবী রায়

তার মাথার ভিতরে—ঐ ফুলবাগান
তার বুকের মধ্যে—ঐ ফুলবাগান

সে পড়েছে, আচ্ছা এক দুঃসহ দ্বিধায়
খাদ মেশানো মগজ যেদিকে যেতে চায়.....

জ্ঞানপাপী এ দুটি চোখ, সেদিকে যেতে চায় না
মহড়া দেখে মনে হল, সত্যি এর তুলনা হয় না!

ফুলবাগান, ও ফুলবাগান, তুই সেই গ্রামে-ই ফিরে যা
এই শহরের ঝুপড়ি-কাঁথা ঠিক তোর জন্য না।!

ও শহর, তোর চোখে চোখ রেখে সেই আমি দেখে যেতে চাই
অহর্নিশ—
আরো ক-তো পাপ, বিষ.....

পাশবিকতা, তুই তবে ঠিক কার ভাই
কোন গাঁয়ে-ঘর? এ দেশের কেউ নোস?
দেখি নীচে নাম, আরো নীচে দেখি ক-তোদূর সক্ষম হোস!

স্ট্রবেরি অথবা অন্য কিছু ❐ পার্থপ্রিয় বসু

মাথার যেদিকটায় একটু ঝাপ্‌সা কুয়াশার মতো
সেখানে নীচু হয়ে একজন কী যেন খোঁজে,
এটা সেটা সামনে বাড়িয়ে দেখেছি
কিছুই পছন্দ নয়। তার ফিরিয়ে দেওয়া জিনিসে
আমার ঘরদোর ভরে উঠছে।
কী খোঁজে সে?

য়ুমথাঙের পথে বারবার বাস থামিয়ে
ছুটে নেবে যাচ্ছিল বারো বছরের রাম—
সকালের শিশিরে ঘাসের ওপর
চুনির দানার মতো স্ট্রবেরি।
কুয়াশার ভেতর সেও কি স্ট্রবেরি খোঁজে?

মানুষের শরীরে যা সম্ভব
সবই তাকে সাধার পর বুঝি
তার খোঁজের কোনো সঠিক চাহিদা নেই।
কী এক অসম্পূর্ণতা তাকে অস্থির করে রাখে।
অনন্ত তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে,
তার কাছে পাওয়া না-পাওয়া দুয়ের তফাৎ নেই কোনো।

ভূমিকা ❐ পার্থপ্রিয় বসু

দুদিক থেকে ফুরিয়ে আসছে বই
শুরু থেকে যত শেষের দিকে যাচ্ছি
শেষের পাতাও এগিয়ে আসছে তত,
বইটা কি মধ্যিখানে শেষ হবে?

অস্থির শেষপৃষ্ঠা আর প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যে
সমাপ্তি অন্তর্লীন হয়ে আছে।
কতটা পড়লাম, কতটা বাকি রইল
পেজমার্ক দিয়ে রাখব ভাবি,
ভাবি শেষপাতায় আঠা দিয়ে
মলাটের গায়ে সেঁটে রাখব।

পাতায় পাতায় নীল অন্ধকারের ভেতর
এক জটিল বিভাষা এসবের আড়াল হয়ে থাকে।
তার অসংখ্য স্বর আর অন্তহীন ব্যঞ্জনের নীচে
মহাসমুদ্রের মাছেরা ঘুরছে।
একেকটা বুদ্‌বুদের মতো ভেসে উঠছে
উপলব্ধি মাৎস্য নীরবতা থেকে।

না-পড়া পাতাগুলোর হাতছানি থেকে
নিজেকে সরিয়ে আনছি,
ভূমিকায় ফিরে যাচ্ছি ফের।

জায়মান ❐ মনোজ কুমার বাইন

জন্মমিল ছিলো কি কোথাও?
নাহলে ইশারায় কেন জেগে উঠি,
হাতে তুলে নিই যুদ্ধের পোশাক—
লবঙ্গ বনের ধনুষ ; নদীজল ছুঁয়ে থাকা
অবাক পাথর লাফাতে লাফাতে উঠে আসে,
মানচিত্রে জেগে ওঠে ভূমি!

কেউ কারো নই তবু অপলক, জায়মান
বোধের ভিতর জেগে উঠি ; স্বপ্নে
তর্জনী ছুঁয়ে চোখ মেলতেই দেখি ঃ
আকাশ — আকাশ!

স্পর্শ ❐ মনোজকুমার বাইন

রতিস্বেদে ভেসে গেছে মায়াবতী
গ্রীষ্মের অমল দুপুরে।
তখন কোথাও কোনো পাপ নেই—
শুধু কান্না আছে ;
আমি সে চোখের জলে সমুদ্র ছুঁয়েছি!

স্পর্শস্মৃতি ❐ জগন্ময় মজুমদার

তোমার আবহ নয় নিলাম আমেজ
ভুলে যাই দৃশ্যপটখানি
ইচ্ছে করেই নেইনি ধরণ কেবল ধারণা
বাকীটুকু বানাই গোপন ঃ

অবগুণ্ঠন, রেলঝিকঝিক, সরে যায় আলো
প্রতিধ্বনি, উসখুশ, দীর্ঘ দুলুনি
ক্রমশঃ তন্দ্রা নামে ; ঈষৎ হেলান
শরীরের উত্তাপে জেগে ওঠে মন

চকিতে একটিবার না না অর্ধেক
ঝলসায় ; দূরতর নৌকার পাল
প্রতিফলনের ভাষা ভুলে যায় কাছের আড়াল
কাঁধ থেকে হাত দিয়ে মাথাটি সরায়

স্পর্শস্মৃতি ; বিস্ময়ের ঘের তোলা বাকী আটাশ বছর

সাইরেণে দীর্ঘ মুহূর্ত ❐ জগন্ময় মজুমদার

মিলিয়ে নিও না ; গীর্জায় ভুল ঘড়ি
তুমি যখন এসেই পড়েছো
তখনই মনে করা যাক্ প্রকৃত সময়

বর্ণমালার ক্রম অনুসারে একটু অপেক্ষা করো

ধরা যাক তোমার নামের আদ্যাক্ষর দিয়েই
যে কোনো ভাষার শুরু

কেবল বিন্যাস আলাদা
পাপড়ির গঠন রীতিতে যা কিছু ভুলভাল
শরীর পোড়ালে
সাদা বা কালো মূলতঃ অঙ্গার

ছিপি খুলছে রোদ্দুর
যাও সামনে বা পেছনে দাঁড়াও

সাইরেণে দীর্ঘ মুহূর্ত

সর্বাঙ্গ পোড়ায় শব্দ ❐ রবীন্দ্র গুহ

একটা মানুষ, দাঁড়ির জঙ্গলে ঢাকা কাটাকাটি মুখ, গাময়
ভ্যাপসা পচা ডিমের গন্ধ। তাই বলে
মাতাল বা ভিক্ষুক নয় সে। অসম্ভব জেদী, আর
কথায় কথায় ফুঁসে ওঠে। সারাক্ষণ স্তব্ধতার স্তর ভেঙ্গে ভেঙ্গে
শব্দের পিছনে ছোটে,
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রণায় ভোগে।

আগাগোড়া ধ্বস্ত বিকৃত পচা পিত্তথলি তার
কেউ তাকে ভালবাসে না, সে বড় দুরাচারী কবি।

শঙ্খমুদ্রায় ফুঁ দিয়ে-দিয়ে সে শব্দ কুড়োয়
ধাপে ধাপে উঠে যায় পাহাড় চূড়ায়
থেতলে যায় পা, থেতলে যায় বুক,
রক্তমাংসের গভীরে পরিপাটি মোহিনী নক্‌শা খোঁজে।
কেউ তাকে বিশ্বাস করে না, ভাবে
সে বড়ই নির্লজ্জ। তাই
তার জন্য স্তব্ধ প্রহর ভালো
সমুদ্রের গভীরতা ভালো
রক্তবর্ণ মদ ভালো
কেউ তাকে প্রশ্রয় দিও না, সে বড় দুরাচারী কবি।

খুঁজবে কাকে ❐ রবীন্দ্র গুহ

ঘুমের মধ্যেও নিশ্চিত কাটে না সময়, আলজিভ ছুঁয়ে ত্রাস নামে
আমৃত্যু চলে ভিতরে প্রতিক্রিয়া, অথচ
পর পর ঘটনা সাজানো যায় না, প্রজাপতি-করুণায়
মাথা নত করে থাকে যমরাজ।
পাহাড়ের গায়ে সংখ্যা থাকে না জ্যোৎস্না বা নৈঃশব্দ্যের, যেমন থাকে না
ফুলের বা ঝর্ণার জলে,
যতই নিকটতম হোক না কেন, তাকে আমি কি ভাবে স্পর্শ করব?
সে পাহাড় নয় ফুল নয় জ্যোৎস্না নয়, তবু—
পানশালা থেকে সরাসরি ওখানেই আসবো আমি
আমার জন্য আয়না ধুতি ধূপচন্দন রেখো না
মুখ দেখা আর দেখানোর কি সে বয়স আছে?
আগুনের পথে যাবো, ছাই মাখতেই ছাই হয়ে যেতে—
তারপর শিলাজল, ঢেউ খেলে খেলে
ঢেউয়ের অতলে, খুঁজে পাবে কাকে!

হতভাগ্য ❐ শুভশ্রী রায়

টেবিলে ঠান্ডা খাবার,
পেট ভরে ক্ষিদে নিয়ে ফিরে
এই খেয়ে তারপর শোওয়া।
ঘুম থেকে উঠে
দ্বিগুণ নির্মম লাগে পৃথিবীকে।

দুঃস্বপ্নের মধ্যে থেকে এসে,
নিঃস্বপ্ন নিদ্রা কে চায়!

কমলিনী ❐ শুভশ্রী রায়

ছোট্ট ফ্ল্যাট দশবার পা ফেললেই ফুরোয়,
সেইখানে ফুটেছ কমলিনী
তোমার কি হবে!
অসংখ্য বইয়ের নীচে চাপা পড়ে গেছে
তোমার শৈশব
টি.ভি:তুতো ভাইবোন সঙ্গী তোমার,
বার্বি চরম বিনোদন।

অথচ এমন তো হবার কথা নয়।
জন্মেছ জেট যুগে, স্ফীত এক শহরে
এই তোমার অপরাধ।

ও পাড়ে দিগন্তে ❐ শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্রের এ পাড়ে দাঁড়িয়ে একজন প্রেমিক
একজন প্রেমিকাকে হঠাৎ ডাকলেন
তাদের চারচোখের মধ্যে সমুদ্রের মাছেরা লাফায়.

এ পাড়ে প্রেমিকের হাতে নৌকো
তাতে চড়ে সে যখন অপর পাড়ে এলো
তখন আহ্নিক গতির জন্য মেয়েটি সরে গেছে

মেয়েটি সরে যাক্ কবিরা চাইছিল না
তবুও এ পাড়ের প্রেমিকের জানা উচিত ছিল যে
সমুদ্রের এ পাড় ও পাড় কদাচ দৃষ্ট হয় না।

রোমন্থন য় ❐ শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

কাল যে বালিকা বৃষ্টি দেখেছিল
আজ সে পেয়েছে অপত্য স্নেহ
আজ তার চুলে খেলে গেছে মধুমাস।

কাল যে মানুষ নৌকোর সাথে
জলকেলী করেছিল অবিশ্রান্ত সারারাত
আজ তার পিঠে দংশন করে উপহাস।

কাল যে ছায়াপথ আমার করতলে
পোষমানা খরগোসের মত খেয়ে গেছে ঘাস
আজ তার কাছে আশ্রয় গড়ে যুবতী শরীর।

ছিন্ন পাতায় ❐ তাপস রায়

খাঁচার পাখিটি আমি কী ভাবে গান শেখাই! শিশু বৃক্ষ নেই
যে ডালে পা দুলিয়ে তুই শিস্ দিবি, সবুজ পাতার আদর
তোকে জড়িয়ে রাখবে খুব, রোদ ছায়া খেলা—তুই হুস্ করে
সীমানা পেরিয়ে ফিরে আবার ফিরে আসবি উন্মোচনে

তোকে কী ভাবে গান শেখাই, এই খাঁচার ভেতরে কোনো প্রতিলিপি নেই
রাজ কাহিনীর কোনো উচ্ছ্বাস নেই, কেবল দুপুর আড়াল করা
এক টুকরো ছায়া, তোকে কিভাবে সাগর শেখাবো বল, একাকী
কী ভাবে আকাশ শেখাবো টুকরো আগুনে

গ্রুপ থিয়েটার ❐ তাপস রায়

ঘুমন্ত রাতের পাখি হঠাৎ ডেকেছে দেখে জেগে ওঠে প্রতিবেশী হাওয়া
নিজস্ব যা কিছু ছিলো খুঁদকুড়ো অতিথির সেবা। ধীরে বহিছে আর
অকারণে খনিজ প্রথায় কানাকানি, শীর্ণ আয়ুটিরে দেখে নিতে
রঙিন সভায় আজ যাওয়া যাক। দিদিমণি পড়েছেন পাতাল পোশাক

অতঃপর খেলা হ'লো, সপ্তস্বর্গ আকাশমঞ্জরী। ফুল খুব দলছুট
শস্য শ্যামলে পায়ে পায়ে পাতার আড়াল। রহস্যের ভয়ে
ড্রপসিন ঠেলে উঠে আসে জঙ্গী বিমান

বাসভূমি ❐ ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত মুখোপাধ্যায়

এখনও মাঝে মাঝে
পুরোন ইচ্ছেগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে
চৈত্রের বাতাস এসে
সব কিছু উথাল পাথাল করে দেয়
টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত বই, খাতা প্যাড,
লাল নীল কলম।

কতদিন ইচ্ছে হত
ওদের গুছিয়ে রাখি
অথচ তোমার বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত ব্যাপার ওরা—
ছিল আমার নাগালের বাইরে

এখন বাতাসেরা কানাকানি করে
তুমি নেই,
আমার ইচ্ছে গুলো এইভাবে থাকবে কতকাল
আমাকে বাসভূমি করে বাঁচতে চেয়েছিলে
অথচ আমারও যে একটি ঘর চাই।

কান্না তোদের রাখব কোনখানে ❐ ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত মুখোপাধ্যায়

বহুদিন ধরে খুঁজে ফিরেছি একটি ঘর,
ও আকাশ, তোমার ওই নীল বুকে একটু জায়গা দাও।
ওখানে মাথা রেখে কাঁদব আমি।

যেমন ছেলেবেলায়,
নিভৃতে রাত গাঢ় হলে,
বুকের কাছে অকারণ কান্না এসে
কিরকম দলা পাকিয়ে যেত,

সেই যে কবে থেকে
খুঁজে ফিরেছি একটি ঘর, ও আকাশ
একটু জায়গা দিতে পার নাকি?

কান্নাগুলো যেন
কতশত আলোকবর্ষ ভেদ করে
উঠে আসে,
ওদের রাখব কোনখানে।

খিলান ❐ ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত মুখোপাধ্যায়

পাখীর পালক তো নয়
নির্দ্বিধায় ছেঁটে দেব
তিন তিনটে বছর

বৃষ্টিতে ধোওয়া পুরোন পাতার মতো
সজীব হয়ে উঠে
মখমলের মতো জড়িয়ে আছে

ভুটানে গুম্ফার নির্জনে
কিংবা মাদারি হাটের ট্যুরিস্ট লজে
সেই সব রাত
মজবুত খিলানে গাঁথা
কাঁচের সার্সিতে জলবিন্দুর মতো
ওদের তুলে ফেলা যায় না।

যেতে হবে একা ❐ আবদুস শুকুর খান

যাবার জন্যই পাথরে রেখেছি পা
গেরুয়া বুকে ভরেছি সাদা পাতা,
স্মৃতি-বিস্মৃতি ; আত্মস্থ হৃদয়, মন
কপালে চরণ রেণু, ঠোঁটে চুম্বন।

যাবো, কিভাবে গেলে পূর্ণ হবে যাওয়া
কার নিঃশব্দ হাত ধরা দেবে অভ্যর্থনায়
কোন সত্তায় এ শরীর হবে সমাসীন।

কালের রুদ্ধতা ভাঙতে চাইছি পথে
অভিষিক্ত হতে চাইছি চেতনায়, গ্রন্থিতে
গুহামুখে, পাখির ডানায় ; চিনতে
চাইছি ডানার নীল ঝাপট ; সীমারেখা
বসতে চাইছি স্তব্ধতায়, পাথরে, অনন্তকাল।

এই মাটি ; মুগ্ধতা, প্রমত্ত উৎসাহ
এই দেখা, ছেড়ে যাওয়া, শূন্যতার
ভেতরে শূন্য, আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়িয়ে
যাবো, অন্তর্গত সংলাপে, প্রচ্ছন্ন আড়ালে
তোমার রচিত গুহামুখে, অনন্ত ঘুমে একা.....

নৈঃশব্দ্যের স্বর ❐ আবদুস শুকুর খান

কতদূর যাবে উড়ে
পাখি কি তা জানে
স্তব্ধতা কত গভীরে বিস্তৃত!

খাঁচা বোঝে শূন্যতা
ছিন্নতার ব্যথা জানে পাতা
স্বপ্নময় নীল ডানা বোঝে প্রেম
খিদের কাঁকর বোঝে নিঃস্ব জননী।

তুমি বোঝ—আমি বুঝি
দুজনার অনন্ত আড়াল
সুখ দুঃখ মৃত্যুর নিভৃত উচ্চারণ
নৈঃশব্দ্যের স্বর!

জীবনের দীর্ঘতর পথে কতটুকু হয় যাওয়া
চলার সীমারেখা একদিন হয় শেষ, ধূসরতার
ধুলো মেখে জীবন থমকে দাঁড়ায় জীবনের কাছে
স্তব্ধতায় পাথর খায় অসমাপ্ত জীবন
সমস্ত নৈঃশব্দ্য অলীক পথের দিকে যায় বেঁকে।

স্বপ্ন ডানা মেলে উড়ে যায় পাখি
শূন্য-সীমানা ছাড়িয়ে অনন্তে কোথাও
পাখি তা কতটুকু জানে!

গানের পদ্ম ❑ অমরেন্দ্র গণাই

দুই চোখ বন্ধ করো
শুনে যাও এক থেকে বারো।
আমি ঠিক বলে দেব
তোমার গানের পদ্ম
ছুঁয়েছিল সে কোন শ্রাবণ

কার হাতে দিয়েছিল তুলে
বৃষ্টির ভেতরে
কতটুকু নিয়েছিলে চূর্ণ জলকণা
কতখানি কাছের ছলনা, কতটা উদাসী।

বাড়ীর ঘোরানো সিঁড়ি
পিদিম নিবিয়ে কেন বলেছিল—
'আজ তবে আসি।'

তোমার বিরহ ❑ অমরেন্দ্র গণাই

তোমার বিরহ কোনদিন ঘাসের মতন
শিশিরের সজল আর্শিতে
দেখেনি আপন মুখ।

বার বার কুয়াশার ওড়নায়
নিজেকে আড়াল করে বেঁধেছিলে খোঁপা
তাতে কতটা বিশ্বাস ছিল
দরদী নদীর?
কতদূরে জেগে ছিল প্রতীক্ষার দ্বাদশ মন্দির।
সেকথা জানোনি কোনদিন।

আজ যদি চলে যাবে
আবার ঘাসের বুকে সাজাবো শিশির।

কবিতার আলো অন্ধকারে ❑ অশোক দাশগুপ্ত

বর্তমানে যাঁরা কবিতা লিখছেন, তাঁরা আধুনিক কবিতা নিয়ে উৎকণ্ঠিত কিনা বোঝা দুরূহ। আলোচনায়, সভা-সমিতিতে কবি যে কবিতা বিষয়ে বলেন না তা নয়। পত্রপত্রিকায়, বিশেষ করে সারা দেশে ছোট ছোট সাহিত্য-পত্রিকায়, 'লিটল ম্যাগ' এই বিসদৃশ ইংরেজী নাম যাদের অহেতুক দেয়া হয়েছে, সে সবে বেশ সরবে যে কবি-পাঠক আলোচনা না করেন তা নয়। কিন্তু লেখার সময় সে সব আলোচনা কবির মনে থাকে কি না কিংবা মনে রাখা সম্ভব কি না তাও প্রশ্ন বটে। এ কথাও উঠতে পারে কবিতা নিয়ে কবি উৎকণ্ঠিত হবেন কেন? অন্যান্য আরও দশটি বিষয় নিয়ে কবি ভাবিত হ'ন বলেই তো লেখেন। উৎকণ্ঠার প্রশ্ন ওঠে কেন? অনেক 'কেন'ই এ সংসারে আছে যার উত্তর সহজ নয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় উত্তর হয়ত সম্ভবও নয়। কিন্তু তাই বলে সেই কেন অন্তর্হিত হয়ে যায় না। বরং গূঢ় বেঁচে থাকে।

"আধুনিক কবিতা"—এ কথার কোন নিঃসংশয় অর্থ আছে কি না সন্দেহ। আধুনিকতায় সম ও স্ব-কালীন ভাবনার একটি মিলিত রূপ থাকে। সাম্প্রতিক সময় ও সে সময়ের ভাবনা উভয়ই পাল্টায়। সময়তো বহেই যায়, অধুনা পৃথিবী মনে ও বস্তুতে যে পরিমাণ দ্রুত পরিবর্তনীয়, তাতে স্ব-কালীন ভাবনাও অচিরগেহ। ফলে আধুনিকতা এক পায়ে ভর রেখে আর পা এগিয়ে চলিষ্ণু, দু'পায়ে দাঁড়িয়ে কোন প্রতিমা নয়।

সেজন্য কবিতার দুটি রূপ খুলে যায়। এক আধুনিকতা, দুই কবিতা হয়ে উঠা। অনেক কবিতাই কবিতা নয়, ছন্দশাসিত কিংবা ছন্দহীন শব্দসমষ্টি মাত্র। যে পংক্তিনিচয় কবিতা হয়ে উঠে তা আধুনিক ও কবিতা, দুটোই। কেননা যে কালে যে লেখাটি কবিতা হয়ে উঠেছে, সে কালের বা তারও চেয়ে এগিয়ে থাকা কালের না হয়ে তা কবিতা হয়ে উঠেনি। যে কোন দেশের, যে কোন সময়ের কবিতাতেই এ দুটো জিনিষ থেকে যায়। অন্যদিকে সাম্প্রতিকতা কথাটিতে এতো জটিলতা নেই। সে সময় নিরূপিত। অস্থিরও, কারণ এ সময়ে যা সাম্প্রতিক, সে সময়ে তা সাম্প্রতিক নয়! যেহেতু বেশির ভাগ পংক্তিনিচয় যা গড়ে, তা কবিতা হয়ে উঠে না, সে জন্য আধুনিক কবিতার সংখ্যা বাস্তবে অল্প, সাম্প্রতিক কবিতার সংখ্যাই অগণন।

বাংলায় প্রচুর পত্র পত্রিকায় ঊর্মি ধারায় কবিতা প্রকাশিত হয়। তাতে কবিতা না হয়ে উঠা কবিতা, সাম্প্রতিক কবিতা, আধুনিক কবিতা পাশাপাশি বিনা ওজর-আপত্তিতে বেশ বসে থাকে। আধুনিক কবিতা অর্থাৎ ভালো কবিতা যা নিজ সময়ের প্রকাশ সৌকর্যে শরীরী তা রূপসী অথচ অতিস্পৃহ হয়ে ম্লান নয়; সাম্প্রতিক কবিতা এ সময়ের সংসারী ব্যক্তিটি—মুখেচোখে হিসেব নিকেশের ছাপ নিয়ে অস্থৈর্য্যে থাকে বটে কিন্তু মন্দ লোক নয়; আর না হওয়া কবিতা একটু কুঁদুলে, নিজ জায়গাটি পাছে চ্যুত হয় সে জন্য সদা শঙ্কিত, ফলে রুক্ষ ও কটুভাষী।

আধুনিক কবিতা বলে যা আজকাল ছাপা হয় তার অধিক অংশই এই না হওয়া কবিতা, তার চেয়ে অনেক অল্প সাম্প্রতিক কবিতা, আর নিঃসন্দেহে অতি সংখ্যালঘু আধুনিক কবিতা।

সব ভালো কবিতাই জন্মস্পর্শ সময়ে আধুনিক। জয়দেবের গীতগোবিন্দ যখন লেখা হচ্ছিল, সে সময়ে আধুনিকই ছিল। সব কালোত্তীর্ণ কবিতা, সার্থক কবিতা, ভালো কবিতা সৃতি সময়ে আধুনিক। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তাই, চসারও তা-ই। আবার অনেক পরে, বোদলেয়রও তাই। সময় বহে গেলেও কোন কবিতা কালোত্তীর্ণ বেঁচে থাকে, কোন সার্থক কবিতা স্মৃতিতে, পুঁথিতে থেকে

যায় কালের প্রবাহজনিত ঘাত-প্রতিঘাতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ। কোন কবিতা ভালো কবিতা হওয়া সত্ত্বেও পুঁথিতেই থাকে, সচরাচর স্মৃতিতে মননে থাকে না। যেমন ঈশ্বর গুপ্তর, বিহারীলালের, রবার্ট হ্যারিকের, রবার্ট বার্নস-এর কিংবা সুইনবার্নের। এদের আধুনিকতা ম্লান হয়ে অতীত সময়ের চাদর গায়ে জড়িয়েও ভালো কবিতা হওয়ার কল্যাণে পাঠের দাক্ষিণ্য পায়। কিন্তু কালোত্তীর্ণ কবিতার আধুনিকতা কি ম্লান হয়ে আসে? যে কবিতা অতীত থেকে এখনও আধুনিক--অর্থাৎ সৃতি সময়ে আধুনিক ও অগ্রগামী এবং এখনও আধুনিক--এই পরিচয়ই তার কালোত্তীর্ণতার অন্যতম লক্ষণ। শৈলীগত প্রকাশে কালিদাসও আধুনিক নন, সেক্সপীয়র-গ্যয়টেও নন, কিন্তু ঐ ত্বক ভেদ করে ওঁরা কি দুর্মরভাবে আধুনিক--এবং সেজন্যই কালোত্তীর্ণ। আরো কবি সেই বৈদিক ও গ্রীসিয় যুগ থেকে তাই। রবীন্দ্রনাথ আগামী বহুদিন তাই থাকবেন।

যে কোন ভালো কবিতাই জন্ম লগ্নে আধুনিক। যে কোন কালোত্তীর্ণ কবিতাই ভবিষ্যত দিনেও আধুনিক। মহাভারতের অনেক চরিত্রই এতো বৈচিত্র্য ও অতল রহস্য নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে থাকে প্রবল আশা নিরাশা দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে এবং সে জন্যই মহাভারত অনিঃশেষ। মানুষের এই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যটি এখনও আধুনিক, আগামী দিনেও তা থাকবে। কারণ সময় যতই মনের পরে বিচিত্র সাজপোষাক পরিয়ে দিক, সভ্যতা মানুষের মনের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করতে যেদিন সক্ষম হবে সেদিন নিজেও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হবে। সেদিন কালোত্তীর্ণ বলে কিছু থাকবে কি না সন্দেহ, আধুনিকতাও দাঁড় পাবে না, শিল্প-সময় বলে ধারণাই তখন অপহৃত হবে।

কবিতায় কোন একটি ভাবকে সঞ্চার করে দিতে হয়। জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ দিতে হয়। কবিতা প্রমাণ-অপ্রমাণের বিষয় নয়। তাই বলে কবিতা তো অজ্ঞানের নয়। যেহেতু ভাবই কবিতার চৈতন্য সে জন্য তা প্রমাণাভিসারী নয় আদৌ, তা সঞ্চারী। ভাবকে সঞ্চার করাই কবিতার ধর্ম। ভাবের এই সঞ্চারই সৌন্দর্য্য, কবিতা নিয়ত সুন্দর।

কবি বলেছিলেন, সত্যই সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্যই সত্য। একথা দর্শন সব সময় মানে কি না কে জানে, কিন্তু কবিতা যে সুন্দর, অসুন্দর যে কবিতা হয় না এ কথা মেনে নিতে কোন দ্বিধার ছায়াপাত ঘটে না। আবার সৌন্দর্য্য স্বভাবতই সংযত স্বভাব, কল্পনাবৃত্তির অসংযত প্রকাশ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অন্তরায় তো বটেই। সে জন্য কবিতার সৌন্দর্য্য সেখানেই ভাস্বর যা শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে ভাষার প্রকাশকে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় গহনতার দিকে। এই গহনতার মধ্য দিয়েই কবির নিজ ভাব সকলের ভাব হয়ে যায়। ব্যষ্টির সমাহিত সমাহৃতি সমষ্টিতে সঞ্চার ভালো কবিতার প্রধান লক্ষণ। সাধারণত যাকে কবি-পাঠকের সংস্পর্শ বলা হয় এ তার চেয়ে গাঢ় ও অর্থবহ। নিজের ভাবকে সকলের করা সমাহিত সাধন' ছাড়া তো সম্ভব নয়। সেজন্য শিল্পে সৌন্দর্য্য সঞ্চার করা শিল্পেরই লক্ষণ। কবি যখন সংবেদ সঞ্চারী তখন তিনি সাধক, সেই ধ্যানেই শিল্পসৌন্দর্য্য বিভব হয়। সব বড়ো কবি তাই।

কবিতায় একের সঙ্গে--অর্থাৎ একটি ভাব, একটি প্রকাশের সঙ্গে--অপর ভাব অপর প্রকাশের অনৈক্যে সৌন্দর্য্যের হানি ঘটে, রসাভাবও ঘটায়। অন্যদিকে সমগ্রকে নিয়ে একটি ঐকতান গড়ে তোলার মধ্যেই কবিতার মুক্তি ঘটে। এই সব মিলিয়ে এক করার জন্য সংকীর্ণ তথ্যের ভার থেকে মুক্ত অনুভবের বিশালতায় কবিতার শিল্পের অভিযাত্রা। সমগ্রকে নিয়ে ঐকতানে সংযমই নিহিত শক্তি। ভালো কবিতায় সংযম ও সংযত প্রকাশ অনিবার্য; অসংযত আবেগ সেখানে দুঃশাসন। অধুনা যে বাংলা কবিতা লিখিত-প্রকাশিত তার অধিকাংশই না হওয়া কবিতা। আধুনিক অর্থাৎ ভালো কবিতার সংখ্যা এর মধ্যে নগণ্য। ভালো কবিতার যা যা লক্ষণ, এই সচরাচর পংক্তিনিচয়ে সে সব

দুর্লক্ষ্য। এসব পদ্যের বেশির ভাগ সংকীর্ণ তথ্যে বদ্ধ। কোন কোন বিশেষ তথ্যকে জ্ঞাত করতে বিশেষ বাচনভঙ্গীই অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠে কবির বৈশিষ্ট্য। কোন ক্ষেত্রে রিপোর্ট লেখার মত পংক্তি সাজিয়ে দেয়া হয় সমাজমনস্কতার পরিচয়। বাংলার সাম্প্রতিক সময়ে এইসব না হওয়া কবিতার মধ্যে বিপ্লব, রাজনীতি, বঞ্চিতের ক্রোধ, বেকারত্বের দুঃখ, নারীমুক্তি, রতি ও যৌনতার আক্ষেপ--এই সব বিষয়হিসাবে উচ্চকিত। এতে দোষের কিছু নেই, বিষয় হিসাবে কবি কি বেছে নেবেন তা কবির নিজস্ব অধিকার। কিন্তু কবিতা নির্ভর করে কবি কি ভাবে ভাব সঞ্চার করেছেন, কতোখানি সফল হয়েছেন তার উপর। যদি তা ভালো কবিতা হয়ে উঠে, তাহলে বিষয়ে কি যায় আসে! কিন্তু এসব বিষয়ে কবিতায়--স্বীকার করতে হয়--বেশির ভাগেই না থাকে নিজের ভাবকে সকলের করার প্রবণতা, না থাকে শোভনতা সংযমের দিকে আকর্ষণ, না থাকে কোন সংহত সাধনার ছায়া। এই সংহত ধ্যান বড়ো কথা, এর তারতম্য হতে পারে, কিন্তু সে ধ্যান চাই। কবি পথে পশরা বিক্রেতা হতে পারেন, করণিক কিংবা মেষপালক কিংবা বিজ্ঞানী হতে পারেন জীবিকায়, কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই কবি হতে হয়। কবি না হয়ে কবিতা লেখা চলে না। আর কবি হওয়াই কবিতার ধ্যান। বাংলায় কেন, অন্যান্য ভাষাতেও অস্থিরমতি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে কবি স্বভাবের অনুবর্তি আচরণ বলে অনেক রটনা হয়েছে। শেক্সপীয়রের সময়ে 'পাব'-এ কবি যশঃপ্রার্থীদের হুল্লোড়, কিংবা ঊনিশ শতকে মানুষ-পক্ষীর গানের যুগে আফিম চরস পক্ষীদের পক্ষ যোগাত। একালেও সব ভাষাতে এসব প্রাদুর্ভাব প্রবল। সেই কালোস্রোত অন্তঃসলিলা কালস্রোতে কালিকলম-কল্লোলে আফিম চরসে ডোবায়নি বটে, কিন্তু উচ্চারণে কথনে দারিদ্র্য ও যৌনতাকে প্রকাশের নদীপথ করার মধ্য দিয়ে রহস্যময়ভাবে ঊনিশ শতকের জারীগান কবিগানের লোকায়ত স্থূল প্রবৃত্তির অনুরণন যে আংশিকভাবে ফিরিয়ে আনেনি তা বলা চলে না। এসবই পরে চারজন যুবক মধ্যরাতে কলকাতা শাসন করে কিংবা ট্রাম লাইন ধরে মাঝরাতে উন্মত্ত দৌড়-এ এসে পৌঁছেছিল।

অধুনা সমাজ বিজ্ঞানের একটি ধারা অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের চরা ছেড়ে জীবন স্রোতের গভীরে পৌঁছায় না। এই জীবিকা-বুদ্ধি বৈদগ্ধ্যের তাপ সত্ত্বেও নিজদেশে পরবাসী। বিদ্যার আন্তর্জাতিকতা এই সমাজ বিজ্ঞানকে নিজ দেশ সম্পর্কে তলিয়ে দেখাকে সংস্কৃতির দায় মনে করে না। এই বিদ্যা কবিতাকে পাশে ফেলে পংক্তিনিচয় নিয়ে নন্দন-বনে ঢুকে শোষণ লাঞ্ছনা শোষন কিংবা অন্যতর উপস্থিত বিষয় নিয়ে খুব গম্ভীর সন্দর্ভ করেন। মানুষের ব্যক্তি সত্তা সেখানে হারিয়ে যায়, থাকে দলবদ্ধ মানুষ অর্থাৎ মানুষ নয়, যূথবদ্ধতাই স্বীকৃত। ফলে কবিতার অবলুপ্তি, সেখানে সমূহ জল্পনা চলে 'হাতিয়ার' তৈরীর। বাংলা কবিতার এতো বড়ো মানসিক বাধা আর কোথাও নেই যা আসে একদিকে অতি-রতি অপরদিকে হাতিয়ার বন্দী হওয়ার দিক থেকে। এই ভান অবশ্য আগেও ছিল। এখন রূপরীতি পোষাক পাল্টেছে। আগে ছিল জমিদার-পত্তনিদার বাবুদের বাড়ী, এখন হয়েছে রাজনীতি ও পত্রিকা দপ্তর।

কিন্তু কবির এসব প্রয়োজন নেই। কবির একটি সংবেদ্য জগৎ থাকে, যেখানে তিনি একক, কারো অধীনস্থ নন, উপরিস্থও নন। তিনি নিজ জীবিকার মানুষটিও নন। তিনি কবি। এ বড়ো দুশ্চর বিষয়। এখানে অকারণ প্রদর্শনের কোন ঠাঁই নেই। সেখানে এক মানুষকে আর মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর কোন স্থানও নেই। কবির সমাজমনস্কতা আর রাজনীতির খিন্ন সমাজমনস্কতা যে এক বিষয় নয়, একথা বিশদ বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ সংঘর্ষমিলন নিয়ে কবি লিখবেন। লিখবেন মহাভারতের মতো। সেখানে তো দ্বন্দ্ব অহর্নিশি, কিন্তু কবির ধ্যানালোকে

ভীমদুর্যোধন ভাসে, ডোবে—ব্যাসদেব শুধু কাব্যলগ্ন। বাল্মিকীও তাই। পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যক্তিত্বশালিনী সাহসিকা একান্ত নির্লোভ নিরুপমা নারী চরিত্রটি যাকে ধরিত্রীমাতার সঙ্গেই কেবল তুলনা করা চলে সেই সীতাকে সৃষ্টির সময় কবিকে কি নির্লিপ্ত সত্যাশ্রয়ী হতে হয়! অশেষ লিপ্তিতে এই নির্লিপ্ত সত্যাশ্রয়—এইই কবিতার সৌন্দর্যবেদী। কবিকে ধ্যান নিয়ে সেই সৌন্দর্য্যবেদীতে পৌঁছাতে হয়, না হলে কবিতা—যা আসলে মানুষের মানস প্রতিমা—তাকে শব্দশক্তি সহযোগে প্রকাশ করা তো হয়ে উঠে না। কবিকে একের মধ্য দিয়ে বহুকে সমন্বয়ে স্পর্শ করতে হয়ঃ

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি—

একদা এদেশে কিশোরীর মন্দির থেকে ঘরে ফেরা প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা ছিল। প্রতিদিন নিয়ে এ কিন্তু বিষয় অতীত হয়েই আজও আধুনিক, অনির্বচনীয়।

শব্দ কবি-স্বভাবে এভাবেই হয়ে উঠে কবিতা।

With the best compliments from

SANJOY ENTERPRISE
12F, J. M. MUKHERJEE ROAD
CALCUTTA-700 009

SPECIALIST IN QUALITY PRINTING

আগামী দিনের একটি যুদ্ধ ও প্রস্তুতিপর্ব ❑ সমরেশ দাশগুপ্ত

সকাল থেকেই মনটা ভার হয়ে থাকে সুবলের রোজই এখন। দুপুর আসার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই মন হঠাৎ হাল্কা হতে থাকে। তার মানে আর একটু পরেই বিকেল। আর বিকেল এসে গেলে তো কথাই নেই—বাবাকে দেখতে পাওয়া। এভাবেই চলবে আজ এক মাস ধরে। একটা মাস তো নয় যেন এক একটা বছর।.....এবং দুপুর থেকেই তৈরী হতে থাকে সুবল। সারা বস্তির লোক বুঝতে পাবে আর একটু পরেই পাড়ার ষোলো বছরের একটি ছেলে শিশুর মতো খুশীতে ডগমগ হয়ে যাবে—সকাল বেলার সুবল যেন বিকেল বেলার সুবল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। যখন পন্টুদার স্কুটার এসে দাঁড়ায়—সুবল বুঝি সেই গাড়ির অপেক্ষায় থাকে—অহ্ কেন এত দেরি হচ্ছে সেই বিশেষ শব্দটা ছুটে আসতে? ঝুলিতে বাবার খাবার নেওয়া হয়েছে। বাড়তি জামাকাপড়, সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখে। দুটো আপেল, তিনটে কলা ঠিক আছে তো! বা এসে গেছে—ঝম্ ঝম্ শব্দটা। পন্টুদা এসে গেছেন। সুবল ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে। আর একটু হলে ওর দুর্বল শরীর ছিট্‌কে পড়তো।

—উঠে আয়, সব নিয়েছিস্ তো ঠিক মতো?

—হ্যাঁ, প্রতিদিনের মতো মাথা নেড়ে বলে সুবল, তুমি স্টার্ট দাও না?

আর তর সয়না সুবলের। গাড়ির প্রচন্ড শব্দ দুকানে নিয়ে সে পন্টুদার পেছনে স্থির বসে বাবার মুখটাই শুধু ভাবতে থাকে। চলতে চলতে পন্টুদা এক সময় বললেন, কাল থেকে তোর প্র্যাক্‌টিস চাই। আরো বেশি করে খাওয়াদাওয়া করবি। আমি পয়সা দেবো।

—কিন্তু এখন কি পারবো পন্টুদা। বাবার এই অবস্থায়?

—উপায় নেই। জুনিয়র টিমে তোর নাম উঠে গেছে।

—কোথায় যেতে হবে এবার? গৌহাটি না ভাইজাগ না কি চন্ডীগড়?

—পরে বলবো। তবে এত কাছে নয়। আরো দূরে।

দেখতে দেখতে ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে শহরের দালান কোঠা রাস্তা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এক সময় স্কুটারটা থামে হাসপাতালের গেটে। গাড়িটা রেখে পন্টুদা সুবলকে নিয়ে লিফ্‌টে চাপে। সাত তলায় মেল ওয়ার্ড। ৫২ নম্বর। সব মুখস্থ হয়ে গেছে। সারি সারি সব রোগী। কতো সুখ, কতো অসুখ। কতো কান্না, যন্ত্রণা। পন্টুদাকে ডাক্তাররা নার্সরা সবাই চেনেন। শহরের এত বড় একজন ফুটবল প্লেয়ার উনি। কতো দেশ বিদেশ ঘুরেছেন খেলার জন্য। এখন নিজের খেলা বন্ধ রেখে ছোটদের ফুটবল খেলার প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন।

ডক্টর সেন বললেন, শুনলাম জুনিয়র টিম নিয়ে নাকি সুইডেনের গথেনবার্গে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ সেরকমই কথা চলছে—আপনার হাসপাতালের ৫২ নম্বর বেডের তারাপদ নস্করের ছেলে সুবল। ওকেও পাঠাবো ভাবছি। সুবল ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করো।

ডক্টর সেন বললেন, থাক থাক। ফিফ্‌টি টু বেড মানে বুকে বন্দুকের গুলী লাগা পেসেন্ট তো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ কেমন আছেন উনি!

—অনেকটা ভালো, তবে এখনো বিপদ কাটেনি। এত রক্ত গেছে। এখনো স্ট্রাগল করে চলেছেন।

সুবল হঠাৎ বলে উঠলো, বাবা বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু? আমার মা নেই, আমার কেউ নেই—শুধু বাবা, আর এই পন্টুদা আর ফুটবল ছাড়া আমার কেউ নেই ডাক্তারবাবু।

—ভয় নেই। তুমি যেমন মাঠে লড়াই করো, তোমার বাবাও এখন তেমনিই ফাইটিং মুডে আছেন। পল্টুবাবু, তারাপদবাবু সত্যি এ যুগের এক রত্ন। তার তো সামান্য চায়ের দোকানের গুমটি—সেই ঝড়ের রাতে তারই দোকানের সামনে একটি মেয়ের উপর তিনটি ছোকরা রেপ করছিল, তারাপদবাবু প্রতিবাদ করতেই তার বুকে গুলি। ওফ্ আজকের দিনে এমন....ঠিক আছে আপনারা যান।

পল্টুদা সুবলকে নিয়ে বাহান্ন ওয়ার্ডে ঢোকেন। সুবল যেন দৌড়ে চলে যায় যেমন মাঠে দৌড়ায়-বাবার কাছে। বাবার বুকে ব্যান্ডেজ, ঘুমিয়ে আছেন মরার মতো। ওফ্ কী কষ্ট এখন বাবার। সুবল ডাকলো, বাবা?

নার্স এসে বললো, এখন ডিস্টার্ব করো না ভাই। এইমাত্র একটা ইনজেক্শন দেওয়া হয়েছে। শুনে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল সুবল। পল্টুদা তাকে সামলান।

—কি হচ্ছে সুবল? তুমি না স্ট্রাইকার? প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে ওস্তাদ—

—কিন্তু পল্টুদা, ঐ শয়তানগুলো.....বাবাকে.....আমি কি আর মাঠে নামতে পারবো? কোনদিন? হঠাৎ তারাপদ নস্কর চোখ দুটো ঈষৎ খুলে বলে উঠল ম্লান গলায়, কেন পারবি না খোকা—তোকে কতো লড়তে হবে, ভয় পেলে চলে? এখুনি?

—কিন্তু ততদিনে তুমি ঠিক বেঁচে উঠবে তো? আমি ঐ শয়তানগুলোকেও রুখবো বাবা।

ততক্ষণে দুচোখ বুজে গেছে সুবলের বাবার। আবার নিঃসাড় নীরব। চোখ বোজা অবস্থাতেই শুধু বললো, তুই বাঁচলেই আমি বাঁচবো খোকা। আমরা তো বাঁচতে চাই রে।

সঙ্গে সঙ্গে পল্টুদা বললেন, ওকে সুইডেন পাঠাবো ভাবছি, গথেনবার্গে। আশীর্বাদ করবেন আপনি। এখন নার্স গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, আপনারা বাইরে যান, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তারপর হাসপাতাল থেকে নেমে স্কুটারের পেছনে সুবলকে চাপিয়ে পল্টুদা ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগলেন মাঠের দিকে। তৈরী হতে হবে। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে যায় সুবলের। এবং হঠাৎ যেন মুখ ফস্কে বেরিয়ে এলো, ওদের কি কোনদিন শাস্তি হবে না পল্টুদা?

মাথায় হেলমেট থাকার দরুণ হোক, কিংবা রাস্তার যানবাহনের অবিশ্রান্ত শব্দের জন্য হোক, অথবা নিজেরই বাহনের চলমান যান্ত্রিক শব্দের জন্য পল্টুদা সুবলের কথা কিছুই শুনতে পেলেন না। তখন সুবল শুধু ভাবছিল পল্টুদা কেন উত্তর দিলেন না কথাটার? না কি তিনি এখন মাঠে আসন্ন যুদ্ধের জন্য ছক্ কষছেন মনে মনে? এক সঙ্গে হুইসিল এবং বন্দুকের গুলির শব্দ ভেসে এলো আচমকা। আমাকে, আমাদের।

সমাজমনস্ক গল্পকার কালীকুমার চক্রবর্তীর নতুন বই

দ্বিপাদ ভূমি ৩৫ টাকা

ক্রান্তিক প্রকাশনী

বংকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কোলকাতা ৭০০ ০৭৩

সংবাদপত্র

এই কবিতাটা কাঁকড়া বিছের মতো ভয়ংকর হ'য়ে উঠলেও
আমার কিছু করার থাকে না
শিরশির আর শ্বাসকষ্ট এঁকে বেঁকে চলে যায় আর
এই শুভযাত্রার গল্প লিখতে গেলেও
সরীসৃপ,
আমার কিছু করার থাকে না
ফণা আর বিদ্যুৎ বড় আকস্মিক
স্বচ্ছন্দে পাঠিয়ে দেয় উড়োজাহাজ
ভেঙে ফেলে সেতু
কেউ ১২ কিংবা ২২শে স্মৃতি হ'য়ে গেলেও
কিছুই করার থাকে না,
গুড়ুম্ ক'রে শব্দ হয়, মুষ্টিবদ্ধ হাত ধ'রে থাকে
ইস্পাত রঙের জিভ
বুকের মধ্যে অসংখ্য গলিরাস্তা ফাঁদে পড়া পতঙ্গের মতো
ছট্‌ফট্ করে
পাখিরা উড়ে আসে
চঞ্চুতে মিলে যায় চঞ্চু
নির্জন সন্ধ্যায় অথবা এলোমেলো ছবির প্রদর্শনীতে
এগিয়ে আসে শিয়াল.....
গর্তগুলো হেসে ওঠে
আমাদের ঘরের সামনের পাথর উঠে যায় পাহাড়ে
বরফ পড়ে এবং ঝর্ণারা
শুকিয়ে যায়, পুড়ে যায় অথবা
পথে পথে ঘুরে বেড়ানো আঙুর
ফেটে যেতে যেতে
গর্ভবতী ক'রে যায় ভাষাকে আর
সব দুঃখী অক্ষরে ভরে যায় প্রতিটি সকাল
কবিদের কিছু করার থাকে না!

পাখি

তোমার ডাকের মধ্যে চুরচুর করে উঠছে
সমুদ্রপতাকা
নুনোবারান্দা ছেড়ে বারবার
কোথায় যে উড়ে যাও
তোমার বসন্তবৌরী রূপ যেন
আমার আত্মার ভাষ্য
আমার শূন্যের ইংগিত, দেখো

তোমার হাড়ের মধ্যে গুহাবীজ
রেখে গেছে 'কুহ'
একবার প্রকাশিত হ'লে
আমার ডানায় এসে
থাবা গাড়বে মহাকাশমাতা!

ও কাঠগোলাপ

আগুন চুম্বন ক'রবে তোমাকে তোমাকে
ও কাঠগোলাপ

তুমি চেনো টিয়া পাখিদের
সূর্যবারান্দা ঠোঁটে, দেহ জুড়ে ঘাসের মোরাম
শিশির সমুদ্রে সেও স্নান সারতো সকালে—সন্ধ্যায়
আজ তার পিরামিড আছে,

তুমি তাকে বারণ করবে বলো
হিরণ্যের দূতী, বলো হরিণ ছোটার করতল
বলো মেধার তড়িৎ প্রতিবেশী
এই শরীর থেকে উঁকি দিচ্ছে
বিষণ্ণ পিতার শ্লেষ
উঁকি দিচ্ছে মাথা খারাপ মায়ের
কেশর.....

তুমি তাকে একবার ছোঁও
দেখো, বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা
হতাশ জাহাজে ফের মাথা তুলেছে
ক্যাপটেনের আলো!

অবরোধ

মেঘের থেকে হাত-পা আর মাথা বেরিয়ে
ঘিরে ধ'রেছে আমাকে.....
পালাবার পথ পাচ্ছি না
তলিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই.....
মেঘ ফেটে গিয়ে এখন সব
বহুরূপী হাওয়ারা
অধিকার ক'রে নিচ্ছে উঠোন
কেউ পেখমে উড়ছে, কেউবা পলাশে
আমি এসব মাধ্যাকর্ষণের কিছু না বুঝেও
প্লাটফর্ম আর প্রজাপতি
বালিশ আর বখশিস্
শ্রাবণ আর স্বপ্নের
লোভে লোভে পিট্‌পিট্ করছি চোখ
আমার এই ভয়ংকর জেগে থাকা
এই ছিপ ধ'রে কান্নাকাটি আর
মাঝিকে পটানোর নিঃশ্বাস ভেসে উঠছে
আকাশে.....
এখান থেকে পালাতে গেলেই
হাত অথবা পা
মাথা অথবা বুক এসে জড়িয়ে ধ'রছে আমাকে!

বৃক্ষস্বর্গের বারান্দা

চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠের মাঠে
দুধঝর্ণা দেখতে দেখতে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে মেঘ আয়ু
আমি আমার তালুর থেকে উড়িয়ে দিচ্ছি পাখি.....
ঘাস পাখিদের ডানা মোড়া শরীরের উপর থেকে
স্বপ্ন শিশিরের মাথা
কেমন ঘুরতে ঘুরতে পলাশ শিমূলের প্রতিজ্ঞায় পা মুছে
ডুবে যাচ্ছে রোজ।
আমার দৃষ্টি বাঁটের মুখে কামড়ে দিয়েই
'ঈ'-কারের মতো একটা হিংস্র জানোয়ার
প্রতিদিন আমার দৃষ্টিবৌটা নিয়ে
পালিয়ে যাচ্ছে বৃক্ষস্বর্গের বারান্দায়.....

এত সবুজ আর গম্ভীর আর অন্ধকার
এই বারান্দা যে
আমি 'ঈ'-কারের ফণা থেকে নেমে
বিরাট গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম
কিছুক্ষণ.....
কিন্তু শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময়
গড়িয়ে পড়লাম, পড়তেই হ'লো আমাকে
জড়িয়ে ধরলাম
বৃক্ষবেদের দুটি পা.....
তারপর শিকড় জুড়ে ছড়িয়ে দিলাম ধনুক বৃষ্টির
তীর.....
সভার শুরুতেই
আমার এই নদী ভিক্ষার ডাক
বৃক্ষস্বর্গের দুয়ার খুলে দিল
আমি জংগল মুখস্থ ক'রতে ক'রতে ফিরে এলাম বাড়িতে
দুধঝর্ণা ছাড়া এখন আর অন্য কিছু ভাবতেই পারি না.....

ভাস্বতী রায়চৌধুরীর কবিতার বই

প্রমা থেকে প্রকাশিত

কবির ঘর ও রাস্তা ১২ টাকা

পাণ্ডুলিপি থেকে প্রকাশিত

আমার মানুষজন্মের বন্ধুরা ২০ টাকা
একটি কি দুটি কেন ৭ টাকা

বয়স ❐ পবিত্র মুখোপাধ্যায়

গ্রাহ্যও করিনি তাকে যে আমার সমান বয়সী ;
আছে অস্তিত্বের কান্ড ডালপালা জড়িয়ে, যেমন
থাকে হাওয়া, যেমন সূর্যের আলো থাকে ;
সে কখনো বলে না আমাকে —
'এতো অবহেলা কেনো, এতো ভুলে থাকার প্রয়াস ?'
সে কখনো বলে, "অন্তর্বাস -
বিমুক্ত শরীর আর কতো স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারে ?"

পাথুরে মাঠের শূন্যে একা গাছ জাগে অন্ধকারে ;
নৈঃশব্দ চুরমার ক'রে উড়ে যায় দূরে রাতপাখি ;
হাওয়া উদাসীন চুলে আঙুল বুলিয়ে
চলে যায় ; ঘুরে ঘুরে কয়েকটা জোনাকী
জীবনের কথা বলে ! হয়তো বা কিছুই বলে না !
একা দারুব্রহ্মা, জাগি গর্ভগৃহে ;
মন্দির চাতালে জ্যোৎস্না হাসে।

দেখি, সে দাঁড়িয়ে, তার মমতা-মসৃণ মুখে ভাসে
তখনো প্রশ্রয়, শান্ত অপেক্ষার মৌন আবেদন।

উপেক্ষা ক'রেছি যা'কে এতোদিন
এবার সে নিঃশব্দে চরণ
ফেলে এসে দাঁড়িয়েছে, শরীর-বিমুক্ত দীর্ঘকায়া।
পেছনে জ্যোৎস্নায় শুয়ে পরিশ্রান্ত আমারই প্রচ্ছায়া।

স্বপ্ন ❐ প্রশান্ত দেবনাথ

আমার ঘুমের পাশে ঝাউবন দোলে
বুকের উপর আর মুখের উপর
উঠে আসে ফুটপাত, জলচ্ছবি, বিপর্যস্ত মুখ
কেন হাহাকার কেন আর্তনাদ
আগুন লেগেছে সবখানে ?
ঘরের বাইরে এসে দেখি
সেই রাতের মতন দিন বন্ধুর কবর ছুঁয়ে....

এই দৃশ্যের আড়ালে ছিল প্রতারক।

রাষ্ট্র হতে ফিরে ❐ ইনাসউদ্দীন

রাষ্ট্র হতে ফিরে এলে তোমার সাথে কথা বলি
ও আমার পানাপুকুর, পরম পোষ্য!
অপরূপ দৃশ্য প্রকৃতির, বন্ বন্ বন্
কণ্টার ওড়ে সবুজ সবুজ দ্বীপ বাবলার মিহিন চাদর
হ্যালো প্রোটোকল, দশদিন খানাপিনা চলে
ওপাশে গরাদের ফাঁকে উদ্ভ্রান্ত বিকলাঙ্গ মানসিক
পৃথিবীর ভারসাম্য ক্রমশঃ হারায়
রাষ্ট্র হতে ফিরে
মনে মনে লুকিয়ে পড়ি তোমার অতলে।
ঐখানে খেলাচ্ছলে ক্ষেপণাস্ত্র পড়ে
সংখ্যাতত্ত্বে কিলবিল আহত নিহত
স্কুলব্যাগে কানাকানি সুপার সুপার হিট
কুইজের মশলায় ভাজাভাজা মাছরাঙা ঝপাৎ ঝপাৎ
পানার পিছনে ছানাপোনা প্রাগৈতিহাসিক
ছাতা ও শ্যাওলার ফাঁকে উদাসীন ইতিহাস
নিঃস্পন্দ নীরব
রাখে না রাষ্ট্রের খবর--আদালত সি বি আই
দূরে কোথাও লাল লাল ধূলো রাষ্ট্রের কনভয়
পরম পোষ্য ধূসর পানাপুকুর
আরো কিছু প্রাগৈতিহাসিক কথা বলো।

অর্ন্তধান ❐ রবীন্দ্র সরকার

(জনৈক কবি-বন্ধুর অর্ন্তধানের পর)

এ কেমন যাওয়া যেখানে ফিরে আসার যন্ত্রণা ছাড়া
আর কোন নিশ্চিত ঘুম নেই
স্থির নক্ষত্র নেই কিছু
তবে কি কোন ভুল হাওয়া তাঁকে
নীল রুমাল দেখিয়ে নিয়ে গেছে
চোরকাঁটায় ভরা সেই বুনো পথের দিকে
অথবা খাঁ খাঁ সেই পড়োবাড়ী
এত কষ্ট ছিল বুকে
এমন জটিল সব হিসেব-নিকেশ
মানুষের কতটুকু জানা যায়
কতটুকু জানা হলে অপূর্ণ থাকে না ঘট
পটের ছবির মতো পোকায় কাটা শরীর

প্রাণের শিশির ফোঁটা ধরে রাখে
বেবাক ভুলের অঙ্ক কষে নির্জনে একা
ভয় তাঁকে ছায়া দেয়, অর্ন্তবাস খুলে
দেখায় মোমের শরীর
খাড়া-পাহাড়, নদী, জলপিপির ডাক.....

জনরব শোনা যায় ছাপার অক্ষরে
ভালবাসা ছেড়ে অনন্ত নক্ষত্রবীথি ধরে
কবি চলে গেছেন জলেরই হাটে
একবার শীতল হতে।

হলুদ পাতা ❐ প্রত্যুষ প্রসূণ ঘোষ

প্রতিটি দিন দশমিকের বিন্দুতে মাপা, উদ্বৃত্ত সবুজ নেই,
সব রঙ মিলে মিশে ধূসরের দিকেই যেতে থাকে,
সব পথ চলে যায় বিবর্ণ হলুদে,
পুরোন বছরগুলো অন্য এক পাহাড় থেকে দেখা
দূর গ্রামের ছোট ছোট সাদা বাড়ির মতো দূরে পড়ে আছে,
অনেক চূড়া পেরিয়ে চলে এসেছি সুদূর উচ্চতায়,
ঝর্ণা লাফিয়ে পড়ছে বিগত যুবকবেলার সমস্ত আবেগ নিয়ে
পাথরের ঢালে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ভালোবাসার নুড়ি।
আগ্নেয় চাবুকের মতো বিদ্যুত এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ঝলসে যায়।
দিন আসে দিন যায়, রাতের নিভৃতে বাতাসের স্রোত-ছাড়া কিছু নেই।
ঝরা মরা পাতার ক্রমাগত উড়ে যাওয়া এখানে সেখানে।
তার ছুঁয়ে উড়ে যায় সাদা ছোট পাখি, তারই ডাকে উড়ে আসে স্মৃতি মেঘ।
দুপুর বিষাদ, রুপোরঙ সূর্যাস্ত যা কিছু অনুক্ত কথা বলে,
কি যেন বলার ছিল মনেও পড়ে না, একা ঘরে অতিথি ভবনে
শুয়ে থাকে যাবতীয় বিলাসিতা, দুঃখিত আসবাব আলমারি
এই চারদেওয়ালের কথার মর্ম জানে। এক মহাদেশে নটরাজের একটি পা,
আর এক গোলার্ধে উদ্যত রয়েছে আর একটি—
মেরুন সোয়েটার আজ কথা বলে ওঠে,
বহু বছরের মেরু ব্যবধান, ঝগড়া সব মিটে যায়,
গাছের পাতার ওপর বৃষ্টির ফোঁটা নামে, ঘিরে থাকে স্বরলিপির ছেঁড়াপাতা
আর সেই গান।

সত্য মিথ্যা ❐ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

নাটকীয় সেই আবেগের দিনে নেমে পড়ি একবুক
গঙ্গার জলে
তুমি তীরে ছিলে
চেঁচিয়ে বলেছি 'তোমাকেই ভালোবাসি'
সে কি উপহাস জ্বেলে নিয়ে হাসি
বলেছিলে 'মিথ্যুক'
তুমি তো দেখোনি ঝলসানো সেই অপমানিতের মুখ।

এতদিন পরে সেই স্মৃতি ফিরে আসে
শীতের দিনের নিঃস্ব দুপুরে পাতা ঝরে মরা ঘাসে
ভরা সংসার এড়িয়ে পেরিয়ে
কিছু মুহূর্ত নিয়ে
বলে গেলে তুমি সব ছক উল্টিয়ে
'তোমার মিথ্যা সত্য করিনি বলে
এখন খাঁচার সব শিকগুলি জ্বলে।'

নির্বাসনের পর ❐ এণাক্ষী আচার্য

অথচ এর পরেই বলতে শোনা যাবে —
ওকে নির্বাসন দিয়ে দাও,
মস্তিস্ক বিকৃতির পর ও মাত্র একবারই
নির্ভুল সুরে গেয়েছিল গান,
অন্ধকারে সবাই নেচে উঠবে প্রবল উল্লাসে।
গাছেদের ভাষা বোঝার মতো একটিও প্রাণী
এরপর জেগে থাকবে না সারারাত।
এ শহরের তিনদিকে জমে আছে ব্যর্থ প্রণয়ের ছাই
শ্বাসকষ্টে ভরে আছে বুক
বিধ্বস্ত ফুসফুস এখনও সয়ে যায়
অনিবার্য দুঃখ, ভালোবাসার নাটুকে সংলাপ।
বলতেই হবে ঘাসমাটির কবরে ওকে নির্বাসন দাও।
সব প্রাচীনতা সব সত্যি কথা
মগজ শুদ্ধি করে বনরেখা বরাবর
গাছের পাতার মতো ছড়িয়ে দিক অজস্র কবিতা।

হিমঘরে ❐ ইন্দ্রানী বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্ত শরীরে আরক মেখে
শুয়ে আছো মা আমার
শবাগারে অদ্ভুত নিশ্চিন্ততায়।

তোমাকে দিয়ে গেছি
এইখানে হিমঘরে
তোমারই কথামত
তাই এত নিশ্চিন্ত !

কিছুকাল পরেই কাঁটাছেঁড়া হবে
শরীর তোমার —
ততদিন আমি মাঝে মাঝে
দাঁড়াবো এইখানে এসে,
দরজা খুলে গেলে পর দেখব
তোমাকে কি এক নিশ্চিন্ত ঘুমে
আছ তুমি, আমারও নাম লিখে যাব
শবাগারের হিম পাতায়।
কেননা, — এই ভালো।

চিতায় ওঠার চেয়ে ঢের ভালো এইভাবে
আরক মেখে শুয়ে থাকা, মৃত্যুর পরে
ছাই হয়ে বাতাসে ভাসার চেয়ে
ঢের ভাল এইভাবে
মানুষের কাছে ফেরা!

স্বপ্ন বুকে পুষে নিয়ে ❐ প্রতীক বন্দ্যোপাধ্যায়

কী অবলীলায় অনায়াস সাচ্ছন্দ্যে
আমার ছেলে ক্যানভাসে বন্দী
করে ফেলে পাহাড়, অরণ্য
দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানক্ষেত, নারী

স্বপ্ন বুকে পুষে নিয়ে
আমার মেয়ে উচ্ছল ফটিক জলে
মনের কলসী ভরে —
আমি পারি না।

আমার অক্ষমতা নিয়ে
মধুর তামাশা করে
আমার সে-ও

জয়দেবের মেলায়
বাউল সাঁঝের অন্ধকারে
ক্ষুদে ল্যাংটো কৃষ্ণদের দেখে
আমার গায়ে শীতের পোষাক
খুব ভারী মনে হয় —
আমি খুলতে পারি না।

এই সময়, যারা দেশত্যাগী হয় ❐ শৌভিক দে সরকার

পায়ের নীচে চলকে ওঠে রক্তহীন সময়
— বাঁধা থাকে না
দেশত্যাগী আই ভি কুজুর, পায়ের নীচে
সর্ষেফুলের বীজ.....
দেখা হয় ডাকা হয় না।

এত দুঃখ ছেড়ে এতখানি পথ
কিভাবে দেখবে তুমি মস্ত ঐ আকাশ?
পায়ের নীচে এতগুলো সন্ধ্যেমণি গাছ —
ডাকা হয় না!
আকাশ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ঐ বুঝি সন্ধ্যেমণি দিন
আকাশ চুঁইয়ে বুঝি ঐ মালঙ্গী বাগান.....

আগুন রেখে বাড়ি ফিরে গ্যালো আই ভি কুজুর
— ডাকা হলো না!

মা-ভূমি ❐ বিশ্বনাথ গরাই

এপথে ছড়ানো এত ধান
ভাষা জাগে তরঙ্গে আমার —

আঁচল পেতেছি, আর প্রাণ ভ'রে দু'হাতে তুলেছি
সেই সব ব্যাকুলতা ; দিনান্তে অযুত
তারায় তারায় ফুটি, এত ফুল আঁচলে আমার!

বুঝিনি কখন নিজে গৌরীর ভূমিকা
নিয়ে, মুগ্ধ, দাঁড়িয়েছি তোমার উঠোনে!

ছোবল ❐ সুশান্ত ভট্টাচার্য

চাঁদকে নিয়তি ভেবে কেউ চাঁদকে জংঘায় তুলে নাচায়
তবু সময় ফেরে না। ফেরে না বলেই অমুদ্রিত কবিতার পর
শ্বাসরোধী এক জোড়া চোখ খাঁচাসহ আমাকে টানে
টানে উৎস মুখে, আমাকে ফেরাতে চায় —

আমি কি নষ্ট হয়ে যাবো? প্রতিবাদ মুখর এই হাত
সম্পূর্ণ নিজের বিরুদ্ধে, ধরো এই আমার খুবলে আনা চোখ
মাংসসহ উঠে আসা হিলহিলে চামড়া, উৎসারিত জিহ্বা

ও, জিহ্বা তুমি আমার বিরুদ্ধে আর একবার উচ্চারিত হও
ও, জিহ্বা, আমাকে ঘৃণা করো
ও, জিহ্বা, পারিবারিক আদালত বসাও, তদন্ত হোক
আমি কোনো সন্তানের অযোগ্য পিতা, কারো লম্পট স্বামী
কোনো মায়ের অবাধ্য সন্তান

ও জিহ্বা, প্রমাণ করো আমি কতোটা হনন বিলাসী

হয়তো কোনো এক দিন ধোয়া ওঠা গাঁজার ঠেক কিম্বা চুল্লুর আড্ডায়
পেট ফুলে সত্যিই মরে যাবো
হয়তো, দু'একটা শোকসভা হবে
হয়তো শহরের কোনো অবাঞ্ছিত কবি খিস্তি মেরে দু'লাইন
কবিতা লিখে ছাপবে পত্রিকায়।

সম্পূর্ণ নিজের বিরুদ্ধে উঠে আসা হাত অন্তর্গত ফাঁদের উপমায়
আমাকে মূল ধরে টানে, আগুনও টানে উৎসমুখে
ও, জিহ্বা আমি কি লন্ডভন্ড করে দেবো সব

আমি কি সব সুন্দরের বুকে ভয়ংকর ছোবল বসাবো!

বাংলায় লিখি ❐ ভাস্বতী রায়চৌধুরী

বাংলায় লিখি বলে মাঝে মাঝে ভয় করে খুব
ভয় করে কেউ কি এসব লেখা পড়বে
একশো বছর পরে পঞ্চাশ বছর পরে
কেউ কি পড়বে বাংলাভাষা
পড়বে কবিতা!
এই সব সন্ধ্যের অন্ধকারে
কেবলই হারিয়ে যাওয়া তারার আলোর দিকে
দু একটা খুঁজে পাওয়া দু'একটা ফিরে আসা
পড়বে কি কেউ!
অমাবস্যায় তিস্তার অন্ধকার জলে
যে সব কবিতাকে ভেসে যেতে দেখেছি অনেকবার
সেই সব ভেসে যাওয়া আমার মতন করে দেখবে কি কেউ!

জানি কেউ কেউ কবি হয় সবাই হয় না
সবাই হয় না! একটু একটু! খুব একটু একটুও কেন
সবই হয় না!

'না হয় নাই বা হল
তোমার কি ক্ষতি তাতে'
এই বলে ধমক দিয়েছে আমাকে আমার কলম
কিন্তু আমি কষ্ট পাই
কবিতা লিখতে লিখতে
কবিতা ভাবতে ভাবতে
আমি কষ্ট পাই
কেউ কি পড়বে
ঘুমের মত এক নদীর ওপর দিয়ে
শনশন বাতাসের মত এইসব হাড় কাঁপানো স্বপ্নের
বয়ে যাওয়া
কিছু কিছু যার লেগে রইল আমার কবিতার গায়ে
মানুষের জন্য লেখা আমার বাংলা কবিতায়

কালীপদ কোঙার অনূদিত গগণ গিল-এর কবিতা

পঞ্চম ব্যক্তি

ফাঁসির দড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে
পঞ্চম ব্যক্তি পা রাখে
পঞ্চম জায়গায়
রোদ বা আঁধার যাই হোক, পঞ্চম মানুষ দেখছে
নিজের ছায়া
পঞ্চম জায়গায়
পঞ্চম মানুষের শুধু সান্ত্বনা এই যে
তার আগেও চারজন আছে

শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বাস করে
সে পঞ্চমজন হচ্ছে না

ফাঁসির দিকে এগোতে গিয়ে

ফাঁসির দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে
প্রথম লোকটি কি ভাবছে?
সে ভাবছে
সে-ও তো শেষ লোকটি হতে পারতো

ফাঁসির দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে
সে হঠাৎ-ই পেয়ে যায়
মৃত্যুর আতঙ্ক থেকে মুক্তি

হঠাৎ ওর কাছে
মায়া মোহ থেকে আলাদা
কেবল একটা জিনিস বেঁচে থাকে --
ঈর্ষা --
শেষ লোকটার প্রতি অশেষ ঈর্ষা।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছে
সে সর্বপ্রথম পিছু ফিরে দেখছে
শেষ লোকটাকে
যেন নিজের সঙ্গে সঙ্গে ওরও মৃত্যু
সুনিশ্চিত করে নিচ্ছে

এক অন্ধকার অসহায় ক্ষণে
এ ছাড়া কেউ কি কিছু করতে পারে?

শহরে ফিরতে ফিরতে

শহরে ফিরতে ফিরতে
সে ভাবলো
আর সব কিছু বদলে যেতে পারে
গলির পাশে গুলমোহর
নিশ্চয় তেমনিই আছে

পৌঁছে দেখলো —
শুধু গাছটাই চলে গেছে।

মাকে ভাগ করা হলো ❐ মনোরমা বিশ্বাল মহাপাত্র

সেদিন গ্রামে মাকে ভাগ করা হলো
গ্রামের আকাশে সেদিন চাঁদ ছিল না
তারাও ছিল না
মাঝে মাঝে শুধু
সমুদ্রের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল
সেদিন মাকে জমিজমা সমেত
ভাগ করা হলো
মায়ের ভরণপোষণের ভার
অর্ধেকটা নিল ছোট ভাই
আর বাকি অর্ধেকটা বড় ভাই
সবাইকে সাক্ষী রেখে
সেদিন মাকে ভাগ করা হলো
বিসর্জিতা মূর্তির মতন
মা বসেছিল চুপচাপ
অপেক্ষা করছিল বিসর্জনের পরে
কখন তাকে ফেলে দেওয়া হবে
সমুদ্রের ভেতরে

(মূল ওড়িয়া থেকে বাংলায় অনুবাদ — ভাস্বতী রায়চৌধুরী)

পাতার মানবী ঃ দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

সদ্যপ্রয়াত কবি দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বইটি পড়তে পড়তে চমকে চমকে উঠছিলাম। মাঝে মাঝে দু'এক পাতা অন্তর অন্তর এমন আশ্চর্য সব কবিতা। এমন কবিতা লিখছিলো দেবাঞ্জলি ইদানীং। চোখে পড়েনি তো! অথচ কত সাধারণ অবান্তর কবিতাই না ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে, চোখে পড়ছে এখানে ওখানে। কিন্তু দেবাঞ্জলির এমন সব কবিতা সেই জায়গা পায়নি।

দেবাঞ্জলির 'পাতার মানবী'র পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, ওল্টাতে ওল্টাতে মনে হল কেন এই বইটি দেবাঞ্জলি বেঁচে থাকতেই ছাপা হল না। দেবাঞ্জলি বইটি দেখতে পেত। সেটা তো এই ভাবনার নিশ্চয়ই একটি বড় কারণ। কিন্তু আরও একটি কারণ — যে কারণে বইটি পড়তে পড়তে আমার মন খারাপ লাগছে — তা হল এই যে দেবাঞ্জলি এই পৃথিবীতে সমস্ত কবিসুলভ মানুষসুলভ কামনাবাসনা ইচ্ছে স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকতে থাকতেই যদি এই কবিতার বইটি প্রকাশ পেত। তাহলে আমি তাকে অন্তত আমার ভালোলাগাটুকু জানাবার সুযোগ পেতাম। আজ দেবাঞ্জলি নেই। দেবাঞ্জলির কবিতা আছে। তাই কি হয়? দেবাঞ্জলির কবিতা আছে মানেই দেবাঞ্জলিও আছে।

ওই মেয়ে পুতুলের পাশে
বসে থাকে চুপচাপ
হাজারটি বাক্যহীন ওর সঙ্গী।
সবাকের সঙ্গে কোনো বন্ধুত্ব করে না। (শিশু)

কিংবা হয়তো তার কবিতারাই পাতা হয়ে 'অসংখ্য পাতার
আবরণ আমাকে ঢাকতে ঢাকতে ঢাকতে ঢাকতে
আমার মানবজন্মকে ঢাকা দিয়ে দিলো।
তখন আমিও —'

দেবাঞ্জলি এখন তার একশ আটজন পূর্বপুরুষের মতই উবে গেছে ফ্রেমের ঘরবাড়িতে —

ঠাকুরদা আর ঠাকুরমার ছবির পাশে
আস্তে আস্তে তোমার ছবিও টাঙানো হয়ে গেল
তোমার আগে একশ আটজন পূর্বপুরুষ
ভাঙা কাঁচ আর চিড়ধরা ফ্রেমের আড়াল আবডাল দিয়ে
মেঘের ভেতর লুকোনো পাখির মত তাকিয়ে আছেন।
তোমার পরে একে একে আমরা উঠে যাবো ফ্রেমের ঘরবাড়িতে
(ফ্রেমের ঘরবাড়ি)

এক সময় মনে হতো দেবাঞ্জলির কবিতায় তার দিদি দেবারতির কবিতার প্রভাব খুব প্রকট। কিন্তু আমরা খেয়াল করিনি কখন যেন সে নিজে এক আশ্চর্য নিজস্ব কবিতার সংসার গড়ে তুলেছে। নিজস্ব শব্দ দিয়ে অনুভূতি দিয়ে রূপরস গন্ধ দিয়ে তৈরী সেই সংসার।

তার কবিতায় বারে বারে আসে মা বাবা ভাইবোন পিসি ঠাকুরদা—এই সব সম্পর্কের মানুষদের নিয়ে তৈরী এক ঘরগেরস্থালীর জগৎ তার কবিতায়—যা হয়তো ঠিক এখনকার নয়। হয়তো এক প্রাচীন হারিয়ে যাওয়া ঊনিশ শতকীয় সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির গন্ধ লেগে থাকে তার কবিতার গায়ে। একটি মেয়েলি জগৎ। রান্নাঘর পানের বাটা চাল ডাল কুমড়ো বেলজিয়ান জার্সি ঠাকুরঘর —

এইসব। দেবাঞ্জলির কবিতাকে এরা অন্য বিশিষ্টতা দেয়। এই মেয়েলি জগৎটিকে দেবাঞ্জলি তার কবিতায় এক অলৌকিক আবহ তৈরীর কাজে লাগায়। 'মা' এই একটি সম্পর্ক নিয়ে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে। তবু দেবাঞ্জলির কবিতায় মাকে আমরা অন্যভাবে দেখতে পাই। এই মা যেন অত্যন্ত লৌকিক হয়েও নিতান্ত অলৌকিক। মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো দেবাঞ্জলির কাছে মা-ই কবিতা, কবিতাই মা।

দেবাঞ্জলির কবিতায় বহুবর্ণ মণিমাণিক্যের কথা আছে। আছে বারবার সূর্য তারার কথা, আছে সোনার কথা। হেমবর্ণ শিশুদের কথা। তবু এই সমস্ত স্বর্ণরেণু মণি মাণিক্য রোদলাগা শস্যখেতের ঔজ্জ্বল্য দেবাঞ্জলির কবিতায় আনন্দের রঙ লাগাতে পারেনি। এক কারণহীন হয়তো কারণহীন নয়-বিষাদ লুকিয়ে রয়েছে। কেননা তার সব কবিতার সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে রয়েছে মৃত্যু চেতনা-কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। এই মৃত্যুচেতনার প্রকাশ যেমন রয়েছে ফ্রেমের ঘরবাড়িতে তেমনি এই চেতনার এক আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে 'ঘড়ি' কবিতায়। পুরো কবিতাটি তুলে দিচ্ছি —

'বুড়ো ঘড়ি রোজ কাঁটার জিভ মেলে
তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে
ও আমার প্রপিতামহের জন্ম দেখছে,
তার আগেও অনেক জন্ম, মৃত্যু
লম্বা লম্বা খড় উড়ছে
হয়তো উল্টে পড়ছে বাসা,
ওর পেছনে চড়াই পাখির ঘরবাড়ি
ওর সামনে কত ঘর ভাঙাগড়া হলো
ওর কাঁটা রাত বারোটা তিরিশে থামতেই
চলে গেলেন মা
ধূসর বর্ষার বিকেলে
ক্লান্ত অসমান সরু দুটি শুকিয়ে যাওয়া পায়ে
যেই ও চৌরাস্তায় এসে দাঁড়ালো
অমনি বাবা
কবে আমরা দলছুট এদিক ওদিক
পুরোনো দেয়ালে নতুন চুনকাম
নতুন চুনও পুরোনো হয়ে এলো,
বুড়ো ঘড়ি তার ঠিক জায়গায় পিঠ রেখে
নতুন প্রজন্মের কাঁচা মাংসের জন্যে
কাঁটার জিভ বাড়িয়ে আছে।
তার পেছনে গড়ে উঠছে চড়াই পাখির বাসা।
(ঘড়ি)

মৃত্যুচেতনা যেমন জড়িয়ে রয়েছে তার কবিতাকে, তেমনই রয়েছে এক শৈশবচেতনাও। শৈশবে ফিরে যাওয়ার, শৈশবে থেকে যাওয়ার আন্তরিক আকাঙ্খা তার বহু কবিতাকে এক নবীন অথচ বিষণ্ণ হাওয়ার মত ঘিরে রেখেছে —

'টগর গাছের তলায়
আমার ছোট্ট শৈশব মুখ ঢেকে বসে থাকে
অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে ভেঙে ফেলে তার পরিণত বয়সকে।

তাই বলে দেবাঞ্জলির কবিতায় পরিণত বয়সের চিহ্ন নেই—তাও তো নয়। নারীপুরুষের কামনা মদির রাত্রির গোপন অনুভব রসায়ন কবিতায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

রূপকথার চরিত্রদের মত কোনো এক পুরোনো প্রাচীন কালের সোঁদা গন্ধ, হারিয়ে যাওয়া অথচ হারিয়ে যাওয়া নয় এই রকম সময়, এই রকম মানুষেরা—এই সবই বারে বারে ঘুরে ফিরে আসে দেবাঞ্জলির কবিতায়। আসলে এই রূপকথার ছাঁচটিই এক রকম করে দেবাঞ্জলির প্রায় সমস্ত কবিতাকেই ধরে রাখে। এই ছাঁচের ভেতর দেবদেবী রাক্ষস রাক্ষুসী দৈত্য আলপনা পেতলের প্রদীপ সবই কেমন করে যেন থেকে যায়। পাতার মানবী সব মিলিয়ে যেন এক রূপকথাই — মা বাবা ভাইবোন সময় অসময় রূপরস গন্ধ স্পর্শ শৈশব যৌবন আলো অন্ধকার জন্ম মৃত্যু সবই সেই রূপকথার চরিত্র হয়ে যায়। মৃত্যু এমনকি মৃত্যুও শেষপর্যন্ত যেন রূপকথারই এক চরিত্র, যে মানুষকে একদিন নিয়ে যায় সেই মহাকাশে যেখানে রূপকথার চরিত্রের মত জড়িয়ে রয়েছে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র আর হারিয়ে যাওয়া মানুষেরা।

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

With the best compliments from

ABHISHEK COOP HOUSING SOCIETY LTD

KUMARPUR
ASANSOL 4
BURDWAN

Through a net-work of WAREHOUSES all over West Bengal, the WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION offers services of storage and preservation of cereals, pulses, jaggery cotton, jute, textiles, papers, cement, steel, coal, machinery and other Merchandise of any size or weight against the losses from pests, rodents, birds, burglars, fires and vagaries of weather. WAREHOUSE RECEIPTS issued by the West Bengal State Warehousing Corporation is a good security for raising loan from the Nationalised Banks.

FOR SCIENTIFIC STORAGE

Please contact

your nearest STATE WAREHOUSE Centres or the :

West Bengal State Warehousing Corporation

(A Govt. Undertaking)

6A, Raja Subodh Mullick Square (4th Floor)

Calcutta-700 013

Phone : 26-6060, 26-6061, 26-6063

Edited by Bhaswati Raychaudhuri and published by Sri Kalikumar Chakravarty
Printed at Ghosh Printers, 9B, Gopal Doctor Road, Calcutta-700 023

Rs. Ten only